আলটুজালটু

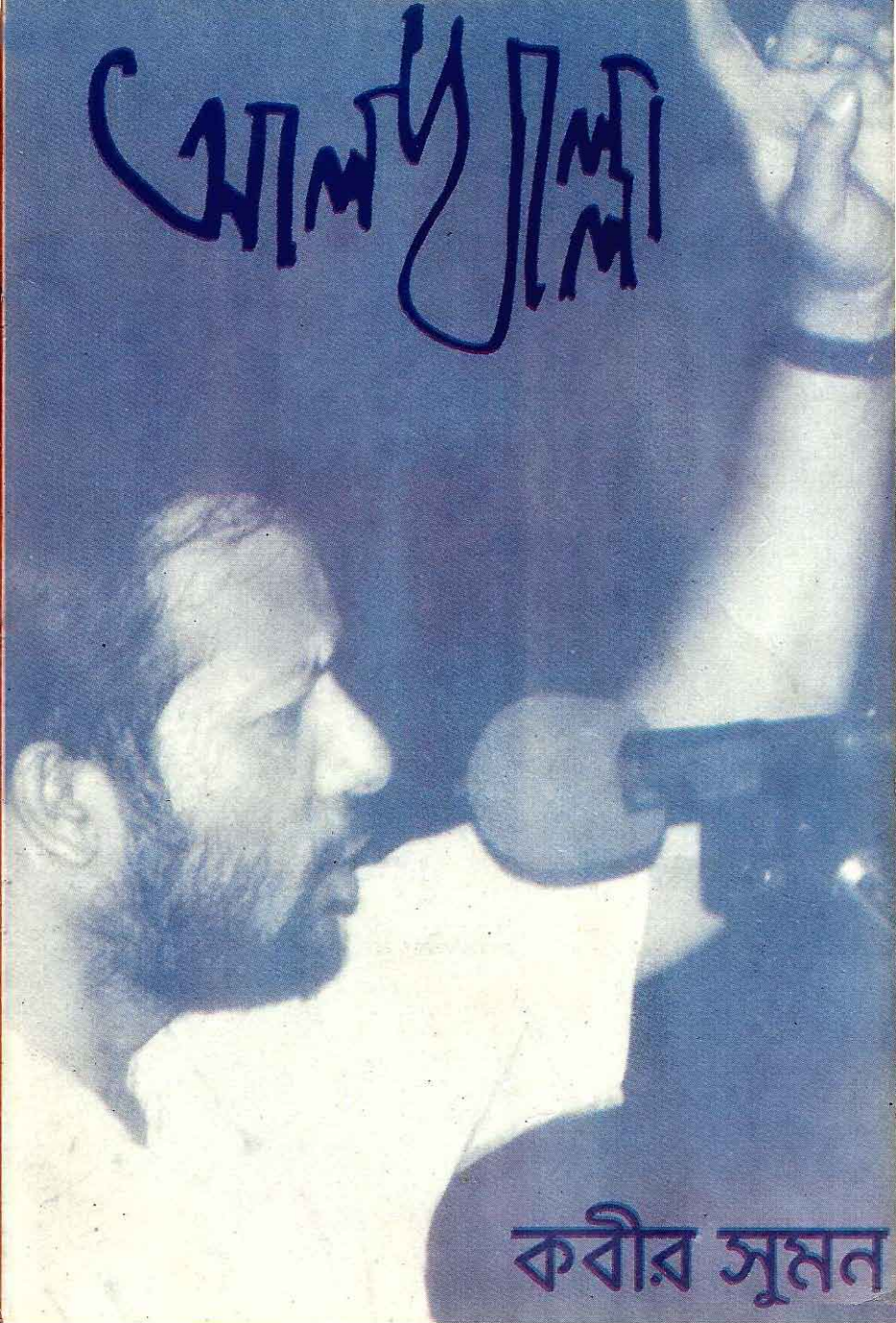

কবীর সুমন

আলখাল্লা

কবীর সুমন
(সুমন চট্টোপাধ্যায়)

সপ্তর্ষি প্রকাশন

পেপারব্যাক সংস্করণ ঃ জানুয়ারি ২০০১

গ্রন্থসত্ত্ব : লেখক
প্রচ্ছদ- পরিকল্পনা, আলোকচিত্র : অরুণ চট্টোপাধ্যায়

সর্বসত্ত্ব সংরক্ষিত। এই বইয়ের কোনও অংশ প্রকাশকের আগাম অনুমতি ছাড়া রিট্রিভাল সিস্টেম কিংবা ইলেকট্রনিক, মেকানিক্যাল, ফটোকপি, রেকর্ডিং বা অন্যভাবে পুনর্মুদ্রণ করা নিষিদ্ধ।
ঋণ স্বীকার : ফোর্থ এস্টেট পাবলিকেশনস

বিনিময় : ৫০ টাকা
(বাংলাদেশ : ৭০ টাকা)

সপ্তর্ষি প্রকাশন,চক্রবর্তী লেন, শ্রীরামপুর, হুগলী থেকে প্রকাশিত এবং দেবী সারদা প্রেস ৩০এ সীতারাম ঘোষ স্ট্রিট কলকাতা-৭০০০০৯ থেকে মুদ্রিত।
প্রকাশক : সৌরভ মুখোপাধ্যায়।

ভূমিকা

১৯৭৫ সালের অক্টোবর মাসে আমি জার্মানির কোলন শহরে 'ডয়েট্‌শে ভেলে' বা জার্মান বেতারের বাংলা বিভাগের সঙ্গে যুক্ত হয়ে পড়ি। বেতনভুক চাকুরে হিসেবে নয়, লেখা-পিছু-পারিশ্রমিকের ফ্রি-লান্স কর্মী হিসেবে। আমার কাজ ছিল জার্মান থেকে বাংলায় অনুবাদ, কিছু স্বাধীন লেখা, পাঠ, ঘোষণা। তখন আমি ডর্টমুন্ড বিশ্ববিদ্যালয়ের ছাত্র। কেবলমাত্র ছুটির সময়ে কায়িক শ্রমিক হিসেবে কিছু রোজগার করার সুযোগ পেতাম। টাকার প্রয়োজন ছিল।

জার্মান বেতারের বাংলা বিভাগে অনুবাদক হিসেবে যথেষ্ট টাকা রোজগারের সুযোগ পেয়ে গেলাম। বাংলা বিভাগ তখন সবে খোলা হয়েছে। জার্মান ভাষায় দক্ষ বাঙালী অনুবাদকের প্রয়োজন ছিল। ঐ ভাষায় দখল থাকায় প্রচুর অনুবাদকের কাজ পেতে লাগলাম। এইভাবে আমার নিয়মিত লেখা শুরু। নানান বিষয়ে।

তার আগে আমি কখনোই নিয়মিত লেখালিখি করিনি। ১৯৭০ ও ১৯৭১ সালে আকাশবাণী কলকাতা কেন্দ্রের জন্য কয়েকটি সংগীত-সমালোচনামূলক স্ক্রিপ্ট লিখেছিলাম। ব্যাস্। তার বাইরে কিছু নয়।

১৯৭৫ সালে জার্মান বেতারে কাজের সুবাদে আমার জীবনের একটা নতুন দিক খুলে গেল। সেই থেকে ১৯৮৯ সালের অক্টোবর মাস পর্যন্ত আমি দু দফায় জার্মান বেতার এবং এক দফা ভয়েস অফ আমেরিকার কর্মী হিসেবে লেখার কাজেই নিযুক্ত ছিলাম। ঐ চোদ্দ বছরের মধ্যে মোট বারো বছর কাটিয়েছি প্রবাসে। ১৯৭৯ সালে একটি বছর কলকাতায় থেকে সংবাদদাতার কাজ করেছি। আর ১৯৮৫ সাল থেকে আবার একটি বছর কলকাতায় থেকে করেছি কিছু গানবাজনার কাজ, লিখেছি একটি বই এবং কয়েকটি প্রবন্ধ-নিবন্ধ। অর্থাৎ পেশা ছিল মূলত লেখা-নির্ভর।

১৯৭৬ সালে আমি 'দেশ' পত্রিকার জন্য জার্মানি থেকে ফিচার লেখা শুরু করি। তখন আমার প্রাক্তন শিক্ষক, কবি অলোকরঞ্জন দাশগুপ্ত 'জার্মানির চিঠি' লিখতেন 'দেশ'এ। আমার লেখাগুলি ছিল জার্মানির সমাজ, সাহিত্য ও রাজনীতি বিষয়ক প্রবন্ধ ও নিবন্ধ। এই সুযোগটি আমায় করে দিয়েছিলেন 'দেশ' পত্রিকার সম্পাদক শ্রী সাগরময় ঘোষ।

১৯৭৬-এ একবার ছুটিতে কলকাতায় এসে তাঁর দপ্তরে গিয়ে আবেদন করেছিলাম। তিনি অনুমতি দিয়েছিলেন।

১৯৭৯ সালে বছরখানেক কলকাতায় থাকার সময়েও কিছু নিবন্ধ লিখেছিলাম 'দেশ'-এর জন্য। লেখার ব্যাপারে শ্রী সাগরময় ঘোষ ও পরে শ্রী সমর সেনের কাছে যে উৎসাহ আমি পেয়েছি, সারা জীবন তা আমি কৃতজ্ঞচিত্তে স্মরণ করে যাব।

১৯৮০ সালে আমি ভয়েস অফ আমেরিকার চাকরি নিয়ে ওয়াশিংটন ডি. সি.তে চলে গেলাম। একটু থিতু হবার পর বাংলা বিভাগের প্রধানের কাছে খোঁজ নিতে গিয়ে জানলাম যে আমাকে বাইরের কোনো পত্রিকার জন্য লিখতে দেওয়া হবে না। তখনও জানতাম না যে এ-হেন নিষেধাজ্ঞা মার্কিন-যুক্তরাষ্ট্রের সংবিধান-বিরুদ্ধ। ঐ সংবিধানের প্রথম সংশোধনী অনুসারে প্রত্যেক মানুষের বাক্-স্বাধীনতা এবং লেখার স্বাধীনতা সুরক্ষিত।

যাই হোক, বিভাগীয় প্রধানের নিষেধাজ্ঞা শুনে ঠিক করলাম অন্য নামে লিখব। 'মানব মিত্র' নামটি আমার সে মুহূর্তের উদ্ভাবন।

ঐ নামেই আমি তার পর থেকে ১৯৮৯ সাল পর্যন্ত 'দেশ' ও শ্রী সমর সেনের 'ফ্রন্টিয়ার' পত্রিকার জন্য লিখেছি। 'ফ্রন্টিয়ারের' জন্য লিখতাম রাজনৈতিক সংবাদভাষ্য ও প্রতিবেদন। আমেরিকা থেকে 'দেশ' পত্রিকায় 'দূরের জানলা' নামে যে মাসিক ফিচার আমি বছর তিনেক লিখেছি তাতে রাজনীতি বিষয়টি প্রত্যক্ষভাবে স্থান না পেলেও সমালোচনার মাত্রাটা থেকে থেকেই হয়ে পড়ত চড়া। ফলে ভয়েস অফ আমেরিকার বাংলা বিভাগে কোনো কোনো সহকর্মী—'দেশ'-এ 'দূরের জানলা' প'ড়ে হাতেগরম আলোচনাও করতেন আমারই সামনে ব'সে। তাঁদের একজন বাদে কেউ জানতেনই না ঐ ফিচারের লেখক তাঁদেরই সহকর্মী।

একবার তো বিভাগীয় প্রধান একটু উত্তেজিত হয়েই আমাদের ঘরে ঢুকলেন 'দেশ' পত্রিকার একটি সংখ্যা হাতে নিয়ে। সেবারে বোধহয় 'দূরের জানলায়' মার্কিন সরকার বা রাষ্ট্রপতি রেগান সম্পর্কে বেশ কঠোর ও বিদ্রূপাত্মক কিছু লিখে ফেলেছিলাম। বিভাগীয় প্রধান গট্‌মট্ ক'রে ঘরে ঢুকে এক সহকর্মীকে জিজ্ঞেস করলেন—'ওয়াশিংটন থেকে কে এইসব লেখা লিখছে? লোকটাকে চেনো?'

তৎপর সেই সহকর্মী আমারই সামনে দাবি করলেন যে মানব মিত্রকে তিনি বিলক্ষণ চেনেন। ভদ্রলোক নাকি ওয়াশিংটন ডি. সি.-তেই থাকে এবং তাঁর স্ত্রী নাকি আমেরিকান।

চোখের সামনে একজনকে এমন ডাহা মিথ্যে কথা বলতে দেখে আমি আর আমার বন্ধু আবদুল্লাহ্ আল-ফারুক হাসি চাপতে না পেরে ঘর ছেড়ে বেরিয়ে গেলাম। বাইরে দাঁড়িয়ে দুই বন্ধুতে হেসে নিলাম একচোট। ফারুক জানতেন মানব মিত্রর আসল পরিচয়।

১৯৭৬ থেকে ১৯৮৯ সাল পর্যন্ত আমার যত লেখা প্রকশিত হয়েছে তা থেকে বেছে নিয়ে দু'একটি সংকলন বের করা যেত স্বচ্ছন্দে। কিন্তু আমি তা করিনি। এ-ধরনের কাজ নিজের উদ্যোগে করার কথা আমি ভাবিনি কখনও।

ঐ সময়ের মধ্যে আমার লেখা একটিমাত্র বই প্রকাশিত হয়। 'মুক্ত নিকারাগুয়া'। ১৯৮৫ সালে আমেরিকার চাকরিতে ইস্তাফা দিয়ে নিকারাগুয়া গিয়েছিলাম সে-দেশের বিপ্লবের প্রক্রিয়া সম্পর্কে সম্যক ধারণা গড়ে নিতে। এ-বইটি লেখার জন্যেই আমাকে নিকারাগুয়ায় আমন্ত্রণ জানিয়েছিলেন বিপ্লবী সরকারের সংস্কৃতিমন্ত্রী, কবি এরনেস্তো কার্দেনাল। বইটি প্রকাশ করেন কে. পি. বাগচি ১৯৮৭ সালের কলকাতা বইমেলায়। আমি তখন দ্বিতীয় দফায় কোলোন শহরে জার্মান বেতারের কর্মী।

সে-বারেও আমি 'দেশ' ও 'ফ্রন্টিয়ারের' জন্য কিছু নিবন্ধ লিখেছিলাম। ফলে বছর-তেরো ধরে ছাপা বেশ কিছু প্রবন্ধ-নিবন্ধ ও সাক্ষাৎকার জমে গিয়েছিল। কিন্তু তার কোনো নির্বাচিত সংকলন কখনও প্রকাশিত হয়নি।

আমি পেশাদার সংগীতশিল্পী ও সংগীতকার। পেশার চাপে নাজেহাল। সারাক্ষণ গান বাঁধার কাজে ব্যস্ত থাকি। অন্য কিছু লেখার অবকাশ প্রায় নেই বলাই ভালো।

কিন্তু প্রকাশক নাছোড়বান্দা। তাঁদের কথা, উৎসাহ ও উস্কানির সামনে আমার প্রতিরোধ টিকলো না।

চোদ্দ বছরের বেতার-সাংবাদিকতা, লেখালেখির নজির আমার ভাঁড়ারে আর বিশেষ নেই। গত বছর ছয়েক ধ'রে আমার জীবন একেবারেই অন্য খাতে বয়ে চলেছে। পুরনো প্রকাশিত লেখাগুলির কপি কোথায় যে হারিয়ে গিয়েছে কে জানে। আমি বড় অগোছালো মানুষ।

শ্রী আশিস ঘোষের তৎপরতা এবং শ্রী অনির্বাণ চট্টোপাধ্যায়ের পরিশ্রমই উদ্ধার করেছে 'দেশ' পত্রিকায় প্রকাশিত পিট সিগারের সাক্ষাৎকার ও 'কহেন কবি কোহেন।' এই লেখাদুটি এ-সংকলনে প্রকাশ করার অনুমতিদানের জন্য আমি 'দেশ' পত্রিকার কাছে কৃতজ্ঞ।

হেমন্ত মুখোপাধ্যায় ও পণ্ডিত রবিশংকরের সাক্ষাৎকার দুটি আমি নিয়েছিলাম যথাক্রমে ১৯৮৭ ও ১৯৮৯ সালে 'ডয়েট্‌শে ভেলে'র কর্মী হিসেবে। হেমন্ত মুখোপাধ্যায়ের সাক্ষাৎকার নিয়েছিলাম কলকাতায় তাঁর বাড়িতে। আর, পণ্ডিত রবিশংকরের সাক্ষাৎকার জার্মানির কোলোন শহরের একটি হোটেলে। দুটি সাক্ষাৎকারই জার্মান বেতার থেকে প্রচারিত হয়েছিল। এ-দুটি এই সংকলনের অন্তর্ভুক্ত করার অনুমতি দিয়েছেন 'ডায়েট্‌শে ভেলে'। আমি কৃতজ্ঞ।

'আলখাল্লা' 'রবীন্দ্রনাথকে' ও 'হুল্‌ফ বিয়ারমান' লেখা তিনটি আমি তৈরী করেছি গত আড়াই মাসে।

*　　*　　*

'আলখাল্লা' প্রথম প্রকাশিত হয়েছিল ১৯৯৭ সালে। সেখানেই শুরু, সেখানেই শেষ। তারপর আর প্রকাশকের দিক থেকে কোনো সাড়াশব্দ নেই। সকলেই ব্যস্ত। একটা কাজ কোনো রকমে হয়ে গেলেই হয়। তারপর আর তা নিয়ে আমাদের বিশেষ মাথাব্যথা থাকে না। এককালে বাঙালি-মানসের এই দিকটা আমায় ভাবাতো। কালক্রমে যা বোঝার বুঝে গিয়েছি। কারণ, নিয়মের ব্যতিক্রমও থাকে। বেশ কিছুদিন বেঁচে থেকে নিয়ম আর ব্যতিক্রম দুটোই দেখে নিলাম। 'ধন্য হ'ল অঙ্গ মম, পুণ্য হ'ল অন্তর।'

এরই মধ্যে শ্রীরামপুর, হুগলির সপ্তর্ষি প্রকাশন 'আলখাল্লা' বইটি আবার ছাপাতে চাইছেন। কেউ যদি আজ নিজের পয়সায় এমন একটা কাজ করতে চান তো তাঁকে কীই-বা বলি।

নতুন কোনো লেখা এতে নেই। 'আলখাল্লা'য় নতুন লেখার দরকারও নেই বোধহয়। তবে কয়েকটি জায়গা কেটে বাদ দিয়ে দিয়েছি, আর সামান্য কিছু বাক্য দিয়েছি জুড়ে।

প্রকাশককে এবং যাঁরা এই বইটি পড়বেন তাঁদের নমস্কার জানাচ্ছি। যাঁরা কোনোদিন পড়বেন না, তাঁদেরও।

কবীর সুমন
(সুমন চট্টোপাধ্যায়)
কলকাতা
ডিসেম্বর, ২০০০

বিষয়ক্রম

আলখাল্লা	৯
পিট সিগারের সঙ্গে কিছুক্ষণ	৫৮
রবীন্দ্রনাথকে	৮০
নিজেকে যে পাল্টায়	৯০
মুখোমুখি : রবিশঙ্কর	৯৫
মুখোমুখি : হেমন্ত মুখোপাধ্যায়	৯৯
কহেন কবি কোহেন	১০৩

আলখাল্লা

অভিজ্ঞতাগুলো, স্মৃতিগুলো ছেঁড়া কাপড়ের মতো। হরেকরকম রঙ। কাপড়ও নানা রকমের। টুকরোগুলো জুড়তে জুড়তে, জুড়তে জুড়তে.....

*　　*　　*

বাবা বলতেন — গানটাকে পেশা করিস না, লোকে সম্মান করবে না। তার চেয়ে দিন চলে যাওয়ার মতো কোনো-একটা চাকরি করবি আর নিজে গান গাইবি।

আশ্চর্য মানুষ! নিজে নিজে ঘরে ব'সে গান গাইবে ছেলে, সে-জন্য ছোটবেলা থেকে ছেলেকে একটানা গান শেখালেন। কত সংগীতশিক্ষকের কাছে পাঠালেন। নিজে রবীন্দ্রসংগীত, হিমাংশু দত্তর গান শেখালেন। খেয়াল শেখার ব্যবস্থা করে দিলেন। আরও কত ধরনের গান। কৈশোর ও যৌবন চ'লে গেল গান শিখতে শিখতে। অথচ বাবা ব'লে বসলেন — গানটাকে পেশা করিস না। লোকে সম্মান করবে না।

*　　*　　*

১৯৬৯ সাল। বি. এ. পরীক্ষা দিয়েছি। তখনও আমরা এস. আর. দাশ রোডের ছোট্ট বাসায়। এক রবিবার সকালে শ্রী হেমন্ত মুখোপাধ্যায় এসে হাজির। সেদিন আমার এক জ্যাঠতুতো দাদাও সপরিবার হাজির।

*　　*　　*

হঠাৎ এলেন কেন হেমন্তবাবু? আমার এক মাসতুতো দাদা জার্মানিতে থাকতেন। তাঁর জার্মান স্ত্রী রেকর্ডে হেমন্তবাবুর গান শুনে পাগল হয়ে গিয়েছিলেন। কলকাতায় বেড়াতে এসে বায়না ধরলেন, সামনে থেকে হেমন্তবাবুর গান শুনবেন।

একদিন কোথায় যেন বাবার সঙ্গে হেমন্তবাবুর দেখা। ব্যাপারটা শুনে হেমন্তবাবু বললেন — এ আর এমন কী। একটা দিন ঠিক করা হল। হেমন্ত মুখোপাধ্যায়ের মতো অত নামজাদা ও ব্যস্ত মানুষ কথা রাখলেন। আমার সেই মাসতুতো দাদা-বৌদি কিন্তু এলেন না। দৈবাৎ এসে পড়লেন আমার জ্যাঠতুতো দাদা-বৌদি।

বাবার অনুরোধে হেমন্তবাবু রবীন্দ্রনাথের একটি গান শোনালেন। আমার জ্যাঠতুতো দাদার ছেলেটি তখন নেহাতই শিশু। বাবা তাকে জিজ্ঞেস করলেন — কিরে, এই লোকটাকে চিনিস?

ছোট্ট সঞ্জয় মাথা দুলিয়ে বলল — হ্যাঁ, হেমন্ত।

সক্কলের হাসি। হেমন্তবাবুরও। বাবা গম্ভীর মুখে রসিকতা ক'রে বললেন — দেখেছ হেমন্ত, এই জন্যেই গানের লাইনে থাকিনি। নাতিরাও নাম ধ'রে ডাকে।

*　　*　　*

মানবেন্দ্র মুখোপাধ্যায়ের গাওয়া একটি গান মাথার ভেতর ঘুরঘুর করে মাঝেমাঝেই। একটু কীর্তনের ছোঁয়া। 'যার কথা ভেবে ভেবে সব ভুলে যাই সে তো নাম ধ'রে কোনদিনও ডাকেনি আমায়।'

*　　*　　*

কস্মিনকালে ভাবিনি নাম ক'রে যাব। ১৯৬৬ সাল থেকে বেতারে গাইছি। ১৯৭২ ও ১৯৭৩ সালে দু'টি রবীন্দ্রসংগীতের গ্রামোফোন ডিস্ক। আকাশবাণীর রবীন্দ্রসংগীতের অনুরোধের আসরে একদিন শুনলাম আমার রেকর্ড বাজছে। তখন ১৯৭৪ সাল। সে কী আনন্দ! কিন্তু নাম করার কোনো ব্যাপার ছিল না।

কষ্ট করে গান শিখেছি। ইচ্ছে করত লোকে শুনুক। কিন্তু নাম? ও চিন্তা সত্যিই ছিল না।

অনেক বছর পর, ১৯৯৩ সালে একটি বড় অনুষ্ঠানে গ্রামোফোন কম্পানি অফ ইন্ডিয়া আমাকে 'তোমাকে চাই' ক্যাসেটটির জন্য 'গোল্ড ডিস্ক' দিলেন। এই পুরস্কার যে আমায় দেওয়া হবে, সেই খবরটি অবশ্য অনুষ্ঠানের বিজ্ঞাপনে দেওয়া হয়নি। বিধাতাই জানেন কেন! কম্পানির এক কর্মকর্তা কয়েক হাজার শ্রোতার সামনে আমার নাম ঘোষণা করলেন 'সুমন মুখোপাধ্যায়'।

আমার নাম হ'ল।

*　　*　　*

সেদিন, মানে সেই অনুষ্ঠানের ঠিক আগে আমি গ্রিনরুমে বসে গিটারে সুর মেলাচ্ছি, এমন সময়ে কম্পানির আর-এক কর্তা ঢুকলেন। পকেট থেকে একটা কাগজ বের ক'রে ইংরাজিতে বললেন — 'দিস ইজ আ পার্ট রয়্যালটি পেমেন্ট।' আমি খালি চোখে পড়তে পারি না। আমার এক বন্ধু কাগজটা হাতে নিয়ে প'ড়ে বললেন — 'চল্লিশ হাজার টাকার চেক রে!'

শিল্পীর প্রাপ্য টাকা কর্তার পকেট থেকে বেরোল। গেঁয়ো যোগীকে কে আর স্বাভাবিকভাবে একটা খামে ক'রে চেক দেয়!

আমি পকেটে পুরে ফেললাম চেকটা। মঞ্চে আমি কী করব তা তখনই ঠিক ক'রে ফেলেছি। তার আগেই জানতাম যে টাকার অভাবে শ্রীমতি অর্চনা গুহর মামলা চালাতে অসুবিধে হচ্ছে। শ্রীমতি অর্চনা গুহ, যিনি শ্রী রুণু গুহনিয়োগী নামে এক পুলিশ অফিসার ও অন্যান্য পুলিশ কর্মচারীর

হাতে অত্যাচারিতা, লাঞ্ছিতা, জখম হয়েছিলেন। 'পার্ট রয়্যালটি পেমেন্ট' পাবার সঙ্গে সঙ্গেই আমি ঠিক ক'রে ফেলি যে ঐ টাকাটা শ্রীমতি অর্চনা গুহর মামলা তহবিলে চ'লে যাবে।

মঞ্চে গান গাইতে গাইতে আমি চেকটা পকেট থেকে বের করে শ্রোতাদের দেখাই। চেক পাবার ঘটনাটা বলি। এবং ঘোষণা করি যে পুরো টাকাটাই শ্রীমতি অর্চনা গুহর মামলার তহবিলে যাবে। মঞ্চ থেকে আমি নির্যাতনকারীদের ফাঁসির দাবি জানিয়েছিলাম।

এই অপরাধে আমাকেও কি একদিন ফাঁসি দেবেন, ধর্মাবতার?

* * *

১৯৯৬ সালে গ্রীষ্মের এক সন্ধ্যায় শ্রী আজিজুল হকের স্ত্রী, আমাদের মণিদীপা বৌদি আমাকে টেলিফোন ক'রে জানালেন — 'এই যে, একটা আনন্দের খবর দিচ্ছি। রুণুর সাত বছর জেল হয়েছে।'

ফাঁসিটা?

হবে না।

পরের দিন কাগজ প'ড়ে জানলাম যে সাত বছর নয়, এক বছর।

খবরটা তবু মণিদীপা বৌদি জানিয়েছিলেন। আর কারুর মনেও হয়নি আমার কথা, আমাদের কথা।

* * *

রায় বেরনোর পরের দিন সারা সকাল অপেক্ষা করলাম। যদি কেউ ফোন করে। কেউ করল না। আমিও তো একটা মানুষ। আমার কষ্টার্জিত অতগুলো টাকা আমি দিয়ে দিয়েছিলাম।

বাবা, তুমি তো আমার প্রথম সংগীতগুরু, তুমি কি কখনও কল্পনাও করতে পেরেছিলে যে আমি স্বরচিত গান বেচে এতগুলো টাকা 'পার্ট রয়্যালটি পেমেন্ট' পাব? যে আধুনিক বাংলা গান নাকি আর বাজার পাচ্ছিল না আটের দশকে আর নয়ের গোড়ায়, সেই গানের বিনিময়ে?

আর আমাদের যথাসাধ্য অবদানের বিনিময়ে মামলার সাফল্যের খবরটা কি টেলিফোন করেও একবার দিতে পারতেন না আমাকে, যাঁরা মামলাটা জিতলেন?

ছিঃ, প্রত্যাশা রাখতে নেই।

* * *

খুব মন খারাপ লাগছিল। এমন সময়ে সপ্তর্ষির ফোন। সপ্তর্ষি। একটি অল্পবয়সী ছেলে যে দুরারোগ্য একটা অসুখে ভুগছে। আমি তাকে এখনও দেখিনি। সে খুব গান ভালোবাসে, তাই মাঝেমাঝে ফোন করে আমাকে। একটু গান শোনায়।

সপ্তর্ষি ফোন করে বলল: 'কাকু গান শুনবে?' ভীষ্মদেব চট্টোপাধ্যায়ের গাওয়া 'শেষের গানটি ছিল তোমার লাগি' দু'লাইন শুনিয়ে দিল ছেলে।

আমি তোমায় প্রণাম করলাম সপ্তর্ষি। তুমি আমার সমস্ত কষ্ট ভুলিয়ে দিলে।

তুমি আছ। সুর আছে। বিধাতা আছেন। যে ফোনের জন্য, যাঁদের ফোনের জন্য অপেক্ষা করছিলাম, সেই ফোন, তাঁদের ফোন এল না। কিন্তু সপ্তর্ষির ফোন এল। নিষ্পাপ ভালোবাসা আর সুর এল টেলিফোন বেয়ে।

আমি নতজানু।

* * *

ভগবান? বিশ্বাস ছিল না। আজও কি আছে? তবু ডাকি আজকাল। কবে থেকে?

বন্ধু, সংগীতশিল্পী অনুপ মুখোপাধ্যায়ের দুটো কিডনিই গেছে, ও আর বাঁচবে না — এই খবর পেয়ে ছুটেছিলাম পি. জি. হাসপাতালে। সেখানে অনুপের দশা দেখে আমি আর থাকতে পারিনি। ওর ঘর থেকে বেরোতে বেরোতেই আমি অনে-ক বছর পর মরিয়া হয়ে ভগবানকে ডাকতে লাগলাম মনে মনে। হে ভগবান, অনুপকে ভালো করে দাও, ওর বৌটার নয়তো কী হবে, কী হবে ওদের ছোট্ট ছেলেটার?

নিশ্চিত মৃত্যুর মুখ থেকে অনুপ একদিন ফিরে এল। কী করে ফিরল, কী করে যে ও বেঁচে আছে ভগবান জানেন।

ভগবানকে কেমন দেখতে জানি না। তিনি আছেন কিনা তাও অজানা। কিন্তু হাসপাতাল থেকে ফিরে অনুপ যখন ফোন করল তখন আমি ভগবানকে বলেছিলাম — 'বেশ দেখালে।' — অনুপকেও বলেছিলাম ব্যাপারটা। অনুপ খুব হেসেছিল। জীবনের হাসি।

সেই থেকে আমি মাঝেমাঝে ভগবানকে ডাকি। এমনিই। এ-কথা ও-কথা বলি।

* * *

অনেকদিন আগে একজনকে চিনতাম। খুব রসিক মানুষ। তাঁর ডাকতাম রফিকদা বলে। রফিকদা ছিলেন ধর্মভীরু মানুষ। ভয়েস অফ আমেরিকার বাংলা বিভাগে আমার সহকর্মী। স্থানীয় ধার্মিক বাঙালিদের ধর্মোপদেশ দিতেন। উর্দু বিভাগের বয়স্ক সহকর্মীরা রঙ্গ করে তাঁকে 'পীরসাহেব' বলতেন। আর রফিকদা আমাদের বলতেন নানান মজার গল্প।

একবার নাকি আমেরিকারই এক বাঙালি মহিলা রফিকদার শরণাপন্না হন তাঁর শিশুপুত্রের একটা সমস্যার ব্যাপারে। বাচ্চাটা বাজ পড়লে

ভীষণ ভয় পেত। কী করা যায়। রফিকদা সেই ভদ্রমহিলাকে পরামর্শ দেন ছেলেকে বলো বাজ পড়লেই আল্লার নাম নিতে।

কিছুদিন পরেই ভদ্রমহিলার ফোন। ছেলে নাকি দাওয়াইটা পরখ করে দেখেছে। তারপর মায়ের কাছে তার কাতর নিবেদন: আম্মু, বাজ পড়লে আল্লার নাম তো আসে না, হাগা আসে।

* * *

মিতু নামে একটি ছোট্ট মেয়েকে চিনতাম। বছর পাঁচেক বয়স। তার বাবা মা ছিলেন ধর্মে মুসলমান। মেয়েটিকে তার কোনো কোনো আত্মীয় নানা কথা বলে খেপাতেন। একদিন কেউ একজন সমানে খোঁচাতে লাগলেন — মিতু আসলে মুসলমান না, হিন্দু।

বারবার এমন বলাতে মিতু ভয়ানক বিরক্ত। রেগেমেগে সে বলে উঠল: আমি হিন্দুও নই, মুসুও নই, আমি মিতু।

সব মানুষ যদি এমন করে ভাবতে শিখত!

* * *

আমার এক বন্ধুর কাছে শোনা। তাঁর ছোট্ট মেয়ে সকলকে ফাঁকি দিয়ে বাড়ি থেকে বেরিয়ে রাস্তায় চলে গিয়েছিল। কোনো এক দায়িত্বশীল মানুষ ছোট্ট মেয়েটিকে দেখে তাকে ধরে ফেলেন। তিনি জিজ্ঞেস করেন

'তুমি কে?'

ছোট্ট মেয়েটির প্রথম উত্তর: 'আমি মানুষ।'

* * *

১৯৯২ সাল থেকে আমাদের টেলিফোন আক্রান্ত। কয়েক বছর ধরে কারা যেন সমানে গালাগাল দিয়ে গেছে। এখনও দেয়। আমাদের বিরক্ত করার আর-একটা জনগণতান্ত্রিক পদ্ধতি হল সমানে আমাদের টেলিফোন করা এবং আমরা ধরলেই অমনি লাইনটা কেটে দেওয়া। অনেক সময়ে আমাদের টেলিফোনটা একটু বেজেই থেমে যায়। আমরা বারবার ধরতে উঠি। ঠকে যাই। কখনও যন্ত্রটা একবার কি দু'বার মাত্র বাজে। খানিকক্ষণ পর আবার। গত চার বছর ধরে এটা চলছে। রোজই বারবার হয়রান হতে হয় আমাদের।

যাঁরা এই সুন্দর কাজটি এতকাল ধরে করে চলেছেন তাঁরা কারা? গ্রামের কৃষক, জেলে, তাঁতি? শহরের ছোট দোকানদার, ফুচকাঅলা, ঝালমুড়ি বিক্রেতা? না। এঁদের কেউ নন। এ-কাজটিতে যাঁরা আজও লিপ্ত তাঁরা সব শিক্ষিত, মধ্যবিত্ত বা উচ্চবিত্ত। তাঁদের হাতের কাছে ফোন আছে নিশ্চয়ই। নয়তো ২৪ ঘণ্টা ধরে এই সুকর্মটি চালিয়ে যাওয়া সম্ভব নয়।

আমার এক বন্ধু আছেন যিনি পুলিশে খুব বড় চাকরি করেন। ১৯৯৩ সালে তাঁর কাছে পরামর্শ চেয়েছিলাম। তিনি বলেছিলেন — দ্যাখ এত সহজে পুলিশের সাহায্য নিস না। যতটা পারিস সহ্য কর।

বিরামহীন টেলিফোন-অত্যাচার সহ্য করা কষ্টকর। তাও যথাসাধ্য কষ্ট করেছি আমরা।

* * *

১৯৯৫ সালে নানান খবরের কাগজে আমার সম্পর্কে একটা মহা আজগুবি খবর প্রকাশিত হয়। কোনো কোনো কাগজে আমার টেলিফোন নম্বরটাও ছাপিয়ে দেওয়া হল। ফলে টেলিফোনে আমাদের কী কী শুনতে হল তা আমরাই জানি।

একদিন হুমকি এল — সাতদিনের মধ্যে শহর ছেড়ে চলে না গেলে প্রথমে আমার মেয়েকে, তারপর আমাকে খুন করা হবে।

খুনের হুমকি আমি অনেক পেয়েছি। মেয়ের ওপর হুমকি আসায় এবারে আমি বাধ্য হলাম পুলিশকে জানাতে। টেলিফোন এক্সচেঞ্জ থেকে আমাদের জানিয়ে দেওয়া হল যে মাসখানেক আমাদের টেলিফোন ট্যাপ করা হবে। তাঁরা আমাদের শিখিয়ে দিলেন কেউ উৎপাত করলে কী করতে হবে।

যথারীতি অজস্র জঘন্য ও বিরক্তিকর টেলিফোন এল সমানে। আমরা প্রতিবারই টেলিফোন এক্সচেঞ্জের নির্দেশ পালন করলাম।

আমার মেয়েকে এবং আমাকে খুন করার হুমকির মতো এক গুরুতর একটা ব্যাপারের পর এবং পুলিশকে জানিয়ে টেলিফোন ট্যাপ করানোর পরেও কিন্তু আমরা আজও জানতে পারিনি কারা অপরাধী। কোনো খবরকাগজে এই দুবৃর্ত্তদের টেলিফোন নম্বর বা পরিচয় প্রকাশিত হয়নি। যেটা কিনা আমার ক্ষেত্রে হয়েছিল তার মাস দুয়েক আগে।

* * *

১৯৯২ সাল থেকেই খবরকাগজে আমার সম্পর্কে নানান খবর বেরিয়েছে। সবই 'বিতর্কমূলক'।

এক ইংরিজি সাময়িকপত্রের বাঙালি সাংবাদিক আমার সাক্ষাৎকার নিতে এসে আমাকে দিয়ে বামফ্রন্ট সরকারের বিরুদ্ধে নানান কথা বলিয়ে নিতে চাইলেন। ফলে তাঁর সঙ্গে কথা কাটাকাটি হল। আমি এই সরকারের আহামরি সমর্থক নই। কিন্তু তাই বলে একজন সাংবাদিক আমাকে জোর করবেন, আমি যাতে যথাসম্ভব বামফ্রন্ট সরকারের বিরুদ্ধে কথা বলি, এটা ঠিক নয়।

তাঁর নামজাদা সাময়িকীতে পরে বেরোল যে সি পি আই (এম) আমাকে ডরায়। এমন কোনো কথা আমি সেই সাক্ষাৎকারে বলিনি।

এরপর একটি একক অনুষ্ঠান করতে গিয়ে তাঁর সঙ্গে দেখা। তখন রাইটার্স বিল্ডিং-এ প্রেস কর্নার তুলে দেওয়া নিয়ে হৈচৈ চলছে। আমাকে দেখেই তিনি এগিয়ে এলে বললেন — সুমনদা, আজ কিন্তু প্রেস কর্নারের ব্যাপারে কিছু শুনতে চাই।

আমি গান গাইতে গাইতে তাঁর নাম করে পুরো ব্যাপারটা ফাঁস করে দিলাম। অনুষ্ঠানের পর তিনি আমায় চেপে ধরলেন। আমি তাঁকে আমারই কাপ থেকে কফি খাওয়ানোর চেষ্টা করে, গায়ে হাত বুলিয়ে অনেক বোঝালাম। তিনি ভুলভাল খবর ছাপাচ্ছেন আবার আমায় উস্কানিও দিচ্ছেন অনুষ্ঠানের আগে, ফলে আমি আমার শ্রোতাদের তা জানিয়ে দিলাম। তিনি এঁড়ে তর্ক করে গেলেন। পাশে আর-একটি ইংরিজি দৈনিকের একজন সাংবাদিক ছিলেন। তিনিও সেই অপরিণামদর্শী সাংবাদিককে বললেন ইংরিজিতে — "তুমি বড় হয়ে ওঠো, ছেলেমানুষী করো না"।

কে কার কথা শোনে। ঘন্টাখানেক যথাসাধ্য বোঝানোর পর, তাঁকে কফি ও সিগারেট খাওয়ানোর পর আমার ধৈর্য্যচ্যুতি ঘটল। তাঁকে আমি তখন বকাবকি করলাম। আশপাশে অনেকেই আমাদের তর্ক শুনছিলেন। আমার অপরিচিত কয়েকজন শেষমেশ সাংবাদিকটিকে বললেন — আর কখনও যেন তোমাকে এ-চত্বরে না দেখি।

অনেকেই সেদিন চটে গিয়েছিলেন তাঁর ওপর।

কয়েকদিনের মধ্যেই একটি বাংলা কাগজে একটি চিঠি বেরোল। সেই সাংবাদিকের লেখা। শিরোনাম : 'সুমন বনাম সাংবাদিকতা'।

কী করে এমন শিরোনাম হয়? সুমন বনাম অমুক সাংবাদিক হতে পারত। অথবা গায়ক বনাম সাংবাদিকতা। তাহলে তা যথার্থ ও সৎ হত। কিন্তু শিরোনামটা এমন দেওয়া হল যেন 'সাংবাদিকতা' বিষয় বা কাজটির সঙ্গেই আমার বিরোধ বা দ্বন্দ্ব। অথবা সমস্ত সাংবাদিককুলের সঙ্গে।

আমাদের রাজ্যের একাধিক সংবাদপত্র এইভাবে বারেবারে সত্যের অপলাপ করেছে। আমার সম্পর্কে উদ্দেশ্যপ্রণোদিত ভাবে যা খুশি লিখেছে। বিতর্কটা প্রধানত তারাই তুলেছে।

* * *

একটি বাংলা পত্রিকায়, ভগবান জানেন কেন, আমার সম্পর্কে থেকে থেকেই চিঠি বেরোত। কত রকমের চিঠি। বিপক্ষে বেশ কিছু। পক্ষে কিছু। আমি সে-কাগজ পড়তাম না। বন্ধুবান্ধব এনে এনে দেখাতেন।

কোনো কোনো চিঠি এত অসহ্যরকম মিথ্যে কথায় ভরা, এতই একপেশে যে আমি উত্তর দেওয়া শুরু করলাম। ছাপা হল।

এটা আমার প্রথম ভুল।

*　　*　　*

"সুমনবাবু, কাল সকালে আমাদের কাগজটা পড়ে দেখবেন। বেশ কয়েকটা চিঠি বেরোচ্ছে আপনার সম্পর্কে।" — রাতের দিকে একটি বাংলা কাগজের ভারপ্রাপ্ত সাংবাদিকের টেলিফোন।

কেন?

*　　*　　*

পড়লাম। গা জ্বলে গেল।

আবার ভুল করলাম।

কাগজগুলো খুঁচিয়ে খুঁচিয়ে চিঠি বের করে, উস্কে দেয়, সুযোগ নেয়। চিঠির সওয়াল-জবাব চলে নামকরা লোকেদের নিয়ে। কাগজ বিক্রি হয়। বিক্রি বাড়ে।

যথেষ্ট অভিজ্ঞতা সত্ত্বেও আমি এই নকশাটা পুরোপুরি ধরতে পারিনি অনেকদিন। নাকি ধরতে চাইনি? বিস্তর ঠেকে, শিখে, দেখে, জেনে পুরো ব্যাপারটা ধরে ফেলার পর ১৯৯৫ সাল থেকে আমি আর কখনও কোনো কাগজে কোনো চিঠি বা রিপোর্ট সম্পর্কে কিছু লিখিনি। লাভ নেই।

*　　*　　*

আমার স্নেহভাজন এক সাংবাদিককে পাঠানো হতে লাগল। তিনি আসতে লাগলেন পাঠকের চিঠি হাতে।

কেন? আমি যাতে চিঠিটা পড়ে উত্তেজিত হয়ে তখনই একটা জবাব লিখে দিই। সওয়াল ও জবাব তাহলে পরপর ছাপানো যাবে। একদম গরম গরম। আহা, কী বিতর্কিতই-না এই গায়ক!

একবার সত্যিই জবাব লিখে দিলাম। তারপর তিনি যখন আবার এলেন পাঠকের চিঠি হাতে, তাঁকে তখন বুঝিয়ে বললাম। তিনি বুঝলেন। আর ও কাজ করেননি তিনি। বেচারিকে নিশ্চয়ই সাজা পেতে হয়েছিল পত্রিকা-দপ্তরে এজন্য।

*　　*　　*

আর এক স্নেহভাজন সাংবাদিক এলেন অন্য একটি বাংলা পত্রিকা থেকে। বললেন, মাইকেল জ্যাকসনের দিল্লিতে অনুষ্ঠান করার কথা। আমি যদি তাঁদের পত্রিকার হয়ে 'কভার' করতে যাই তাহলে খুব ভালো হোটেলে সপরিবারে থাকতে পারব, প্রচুর টাকা পাব।

দুপুরবেলা একটু চুপিসাড়ে এসেছিলেন তিনি। আমি রাজি হলাম না। নিজে শিল্পী হয়ে অন্য শিল্পীর অনুষ্ঠান 'কভার' করতে পারব না। তিনি বারবার বললেন — অনেক টাকা পেতে কিন্তু!

টাকা কার না দরকার? কিছুতেই যখন রাজি হলাম না, তিনি তখন বললেন — তাহলে কথা দাও, অন্য কোনো পত্রিকার জন্য লিখবে না এই অনুষ্ঠান নিয়ে।

আমি তাঁর গাল টিপে দিয়েছিলাম। তাঁর কি মনে পড়ে এসব?

* * *

অনেক নাম দিতে পারছি না। আমার তো সবকিছু টেপ করা নেই, ছবি তুলে রাখা নেই, সাক্ষ্যপ্রমাণ নেই। যে কেউ অস্বীকার করতে পারেন। কয়েকটি নাম দিলেই আবার মামলা হবে। টাকা কোথায় যে লড়ব?

তাহলে বিশ্বাসযোগ্যতা? ধরে নিন-না-কেন বানিয়ে বানিয়ে লিখছি। যদি সেটাও ধরে নেন তো আমার কল্পনাশক্তির অন্তত তারিফ না করে পারবেন না।

* * *

"সুমনবাবু, অমুক পত্রিকা খুব লেগেছে দেখছি আপনার পেছনে। সেরকম বুঝলে আসবেন আমাদের কাছে। আমরা আছি।"

— কহিলেন আর-এক বৃহৎ পত্রিকার একজন মহিমান্বিত সাংবাদিক, লেখক।

হুজুর, যাইনি আপনাদের কাছে।

তাই বুঝি আপনারাও লাগলেন? হুজুর মনে আছে? ১৯৯৩ সালে বলেছিলেন এক শুভলগ্নে। তারপর কত শুভ লগ্ন চ'লে গেল হুজুর। আপনারা সেই একই থেকে গেলেন।

* * *

এক শ্রমিক আন্দোলনের প্রতিনিধির ডাকে সাড়া দিয়ে সেই আন্দোলনের সমর্থনে এগিয়ে গেলাম। ১৯৯৩ সালের শেষ দিক। তখনও সে-আন্দোলনে যোগ দেওয়াটা ফ্যাশান হয়ে দাঁড়ায়নি। গান গাইলাম। কারখানার দরজা ভেঙে শ্রমিকরা যেদিন দখল নিলেন, সেদিন সকালেও আমি ছিলাম।

কয়েক হাজার শ্রমিক কী শান্ত হয়ে, আত্মপ্রত্যয়ে অটল থেকে ব'সেছিলেন ঠাণ্ডা মাটিতে। এমন সুন্দর দৃশ্য ক'বার দেখেছি?

মনে হয়েছিল — সমাজটা কি তাহলে পাল্টাতে শুরু করেছে? তার আগের দিন সস্ত্রীক গিয়েছিলাম শ্রমিকদের কাছে। অনেকক্ষণ ছিলাম। গিটার বাজিয়ে গান গেয়েছিলাম। শ্রমিকরা শুনছিলেন।

গেট-ভাঙার সকালেও প্রতিজ্ঞায়-অটল শ্রমিকদের সামনে আমায় প্রায় ঠেলে তুলে দেওয়া হ'ল। আমি কী করব? আমি এক সামান্য গায়ক, যে ভাবছে — ইতিহাস বুঝি পাল্টাতে চলল।

চারিদিক শান্ত। শীতের সকাল। আলোছায়ায় ব'সে আছেন শ্রমিকরা। শান্ত। একজন নেতা বক্তব্য রাখলেন। এবার আমার পালা।

*　　*　　*

কম্‌পানিয়েরো, আমি নিকারাগুয়ার বিপ্লবের সাক্ষী। এ-জীবনে আমি অনেক দেখে নিয়েছি, কম্‌পানিয়েরো-কম্‌পানিয়েরা।

আমি 'মেকানইজ্‌ড' যুদ্ধ দেখেছি। বিপ্লববিরোধীদের 'ফ্লেম-থ্রোয়ার' আর 'এসল্ট রাইফেলে' নিহত নিরীহ বাচ্চাদের মৃতদেহ দেখেছি। মাইন বসানো মাঠে হাঁটতে বাধ্য হয়েছি। প্যান্টে হিসি করে ফেলেছি, কম্‌পানিয়েরো, প্রাণভয়ে।

গেরিলাদের দেখেছি — তাঁরা বিশ্বমানবতা, লাতিন আমেরিকা আর চে গেভারার নাম নিয়ে বন্দুক হাতে তুলে নিয়েছেন।

'কম্‌ব্যাট' -এলাকায় কাজ করেছি, সাংবাদিক হিসেবে, হুজুর। আপনি, আপনারা হুজুর জানেন না, সেটা করতে গেলে কী কী প্রস্তুতি লাগে। জানেন না, আমেরিকা যখন ছোট্ট একটা দেশের সঙ্গে যুদ্ধ করে, তখন সেই দেশটায় গিয়ে কী কী দেখতে, জানতে, শিখতে হতে পারে। আপনারা, হুজুর, আপনাদের ইনফর্মার, খোঁচড়, 'কিলাররা' কোনোদিন জানবেন না একটা সামান্য গানের কারিগর আর গাইয়েকে কতটা পথ পেরোতে হয়েছে। কতটা ঝুঁকি তাকে নিতে শিখতে হয়েছে, কিভাবে 'কম্‌ব্যাট' শেখানো হয়েছে তাকে, কারা শিখিয়েছে, কী কী শিখেছে সেই লোকটা এ-জীবনে, কী কী দেখেছে-জেনেছে-করেছে-শিখেছে-পেরেছে — কিছুই জানবেন না আপনারা।

ঠিক যেমন আপনারা অনেকে ভাবতেও পারবেন না সেই শীতের সকালে কারখানা দখলকারী শ্রমিকদের ওভাবে ব'সে থাকতে দেখে আমার মাথার মধ্যে কী হচ্ছিল। আমি খালি গলায় গেয়ে উঠলাম — 'হাল ছেড়ো না বন্ধু!' অনেকগুলো মুষ্ঠিবদ্ধ হাত ওপরের দিকে উঠে গিয়েছিল।

হে 'হাল-ছেড়ো-না', কারা তোমায় 'বুলবুল' বানিয়ে দিল? একটা পত্রিকা?

"সে পাড়া জুড়নো বুলবুলি নও তুমি
বর্গীর ধান খায় যে উনতিরিশে...."

— সুধীন্দ্রনাথ দত্ত।

*　　*　　*

কত টাকা দিয়েছি আমাদের এই সামান্য পরিবারের তরফ থেকে? কত টাকা তুলে দিয়েছি গান গেয়ে দিনের পর দিন? দেশের আরও কত মানুষ কত টাকা দান করেছেন? কতগুলো অনুষ্ঠান করেছি বিনা পারিশ্রমিকে? অমুক সমিতি, তমুক মঞ্চ, তমুক সংস্থা কী বলেন?

যেদিন আমি আক্রান্ত হলাম, বন্ধুরা কোথায় ছিলেন?

"কাহারও অসুখ, তাই আসিতে পারিলেন না। কাহারও বড় সুখ, একটি নাতি হইয়াছে, তাই আসিতে পারিলেন না।"

— বঙ্কিমচন্দ্র চট্টোপাধ্যায়।

নাম যখন ছিল না, পৃথিবীটা তখন এক। নাম করার পরই — বা রে দুনিয়া!

এ-জগতে যে কত পরোপকারী মানুষ আছেন, নাম না করলে জানতেই পারতাম না। অপরের অসুখ, ঘাটখরচা, মেয়ের বিয়ে, বেড়ালের অন্নপ্রাশন, নাটকের 'প্রোডাকশন কস্ট' তোলা, 'টেবিল টেনিস ক্লাব' খোলা, রক্তদান, পুণ্যাত্মাদের গলায় মাল্যদান, পাঠাগার, ব্যয়ামাগার, শৌচাগার, স্কুল খোলা, তাঁবু ফেলা, পাহাড়ে হাঁটতে যাওয়া, অমুক সমিতির তহবিল, হ্যান্ডবিল কিলবিল, অনাবিল....। পারলে বিনি পয়সায়, নয়তো যথাসম্ভব কম টাকা (বড়জোর প্রযোজনা-খরচ, মানে সাউন্ড সিস্টেমের ভাড়া, গাড়িভাড়া, ব্যাস্ ব্যাস্ ব্যাস্) ঘাম ঝরিয়ে গেয়ে-বাজিয়ে দিতে হবে তিন ঘণ্টা। মানে, আমি গলদঘর্ম হয়ে পরিশ্রম করব মঞ্চে, আবার পয়সাও পাব না। টাকা?

সে কি!

টাকা নেন নাকি!

আমি খাটব, বিনিময়ে কিছু পাব না। — যেদিন নাম থাকবে না, অভাবে ধুঁকব, সেদিন আমারই মতন নাম-করা কাউকে দিয়ে আমার সাহায্যার্থে আবার সেই নিখরচায় অনুষ্ঠান করানো হবে। তাঁরও অপরাধ : তিনি নাম করে গেছেন।

* * *

যখন বিপদে পড়লাম, আমার পরোপকারী ক্লায়েন্টরা তখন কোথায় গেলেন?

'কেমন জপিয়ে ফাংশানটা করালাম দেখলি!'

* * *

১৯৯১ সাল।

"তোমার পরিবারের কথা তুমি ভাববে কেন? আমরা ভাবব।"

"মেয়েকে স্কুলে দেবে? আমরা আছি কী জন্য?"

সবই দেব। শুধু একটু আমাদের কথামতো চলো। অমুক বলো, সঙ্গে চলো।

পারলাম না স্যার।

* * *

১৯৯২ সাল।

"আমরা বছরে এই শ'তিনেক অনুষ্ঠান করি। আপনি তার মধ্যে, মাসে দশটা করুন। এভারেজে পাঁচ হাজার নিন। মাসে কত হয়?"

এটাও পারলাম না স্যার।

*　　*　　*

১৯৮৯ সাল পর্যন্ত যে লোকটা ছিল একটি বিদেশী বেতার কেন্দ্রের একজন সিনিয়র এডিটর, যার মাইনে বেশ পুরুষ্টুই ছিল, যে লোকটা সব ছেড়েছুড়ে দিয়ে কলকাতায় এল বাংলায় গান বেঁধে গাইবে বলে, তাকে কিনবেন? ছিঃ, এত ক্ষমতা আপনাদের, একটু খতিয়ে দেখবেন না?

*　　*　　*

"সব অমুক আমাদের টাকা নিল, আপনি নিলেন না কেন?"

— এক বন্ধু হয়ে ওঠা অভিজ্ঞ প্রফেশনাল (রাজনীতিবিদ) আমাকে জিজ্ঞেস করলেন।

নাম বলব? পাগল? সারাক্ষণ পকেটে পিস্তল নিয়ে ঘুরে বেড়াব? আর আমার বাড়ির লোকরা?

তাছাড়া, কোনো কথাই যে টেপ করে রাখিনি। ঘটনাস্থলে যাঁরা সাক্ষী ছিলেন, তাঁরাও ভয়ে কেউ মুখ খুলবেন না।

তাহ'লে এগুলো লিখছি কেন? গল্প বানাচ্ছি ফেনিয়ে ফেনিয়ে। নিজেকে আরও 'বিতর্কিত' ক'রে তুলছি, বুঝলেন না? বইটা হয়তো এইসব আষাঢ়ে গল্পর জন্যেই পড়বেন। পড়ছেন তো?

*　　*　　*

"A violent man will die a violent death, that's the law of nature."

— An old Kung-Fu Saying

"সুমন, অমুক মঞ্চে কোনো ফাংশান নিয়ো না। প্ল্যান হয়েছে। খবর বেরিয়ে পড়েছে। প্রথমে গুণ্ডারা এসে তোমার যন্ত্রগুলো ভেঙে দেবে। তুমি তো বাধা দেবেই। তখন তোমাকে খুন করবে। মিটিং ক'রে ঠিক করেছে ওরা। একদম ভেতরকার খবর।"

যে বন্ধুটি আমাকে এ-খবর দিয়েছিলেন ১৯৯৪ সালে, তাঁকে ধন্যবাদ।

*　　*　　*

"আপনাকে আমরা সম্বর্ধনা দিতে চাই অমুক ক্লাবে।" — জানালেন এক বাংলা দৈনিক পত্রিকার সম্পাদক ১৯৯৫ সালের মার্চ মাসে।

কেন?

"বাংলা গানে আপনার অবদানের জন্য"।

বাংলা গানে তো আমার আগেও কেউ কেউ অবদান রেখেছেন, যেমন ধরুন অভিজিৎ বন্দ্যোপাধ্যায়, জটিলেশ্বর মুখোপাধ্যায়। তাঁদের সম্বর্ধনা দিলে হ'ত না?

"না না, আগে আপনাকে। বুঝতে চেষ্টা করুন।"

অনেককাল ধরেই তো বুঝতে চেষ্টা করছি। বুঝতে পারছি না।

"পারবেন। এটা দরকার।"

তা, আমি গাইয়ে লোক, কোনো ছোটখাটো মঞ্চে হলে হ'ত না? অত বড় ক্লাব কেন?

"ওটারও দরকার আছে।"

কৌতূহল হ'ল। রাজি হয়ে গেলাম।

সম্বর্ধনা হবে কলকাতার মস্ত নামজাদা এক ক্লাবে। ১৯৯৫ সালের দোসরা মে। "আমরা কিন্তু নেমন্তন্নর কার্ড তৈরি করছি।"

* * *

১৯৯৪ সাল থেকে একটি কাগজে কোথাও না-কোথাও আমার উল্লেখ। ঘন ঘন। বড্ড বেশি ঘন ঘন। থেকে থেকেই ফোন। নানান অছিলায় আমার গতিবিধি, ভাবনাচিন্তা, কাজকর্ম ইত্যাদি সম্পর্কে খবর নেবার চেষ্টা।

কয়েক জোড়া অদৃশ্য চোখ যেন আমায় অনুসরণ করে চলেছে সমানে। আমার প্রায় প্রতিটি অনুষ্ঠান সম্পর্কে বিরুদ্ধবাদীদের চিঠি বেরোচ্ছে প্রধানত একটি কাগজেই। কখনও সখনও, তার পরেই আমার পক্ষে একটি চিঠি।

* * *

অসম্ভব আজগুবি সব চিঠি। আমি নাকি কোন অনুষ্ঠানে আগেকার শিল্পীদের সম্পর্কে কী বলেছি। আদপেই যা বলিনি, বলি না এমন সব কথা বানিয়ে বানিয়ে লিখে বিশেষ একটি কাগজে পাঠাচ্ছেন কারা? বাংলার কৃষক, তাঁতি, জেলে? রাস্তার ছেনোগুণ্ডারা? পানঅলারা? পাটের দালালরা? সিনেমার টিকিট ব্ল্যাকাররা? না 'শিক্ষিত', 'সংস্কৃতিবান' ভদ্রলোকরা।

অথচ, আমার আগে আর কোনো গীতিকারের লেখা আধুনিক বাংলা গানে আগেকার শিল্পীদের নাম পাওয়া গিয়েছিল কি? ধরুন আধুনিক বাংলা গানে সলিল চৌধুরী, পঙ্কজকুমার মল্লিক, দিলীপ কুমার রায়, আমীর খান, বেগম আখতার, নির্মলেন্দু চৌধুরী, পান্নালাল ভট্টাচার্য, অখিলবন্ধু ঘোষ — এঁদের নাম? বা রেকর্ড হওয়া আধুনিক বাংলা গানে, জনপ্রিয় গানে, আমি লেখার আগে, কখনো কি শ্রোতারা কোনো কণ্ঠ শিল্পীর নাম শুনেছেন? বোধহয় না।

তবুও কারা যেন সমানে চেষ্টা করে গেছেন ঠিক উল্টোটাই প্রমাণ করতে। প্রধানত একটি বাংলা কাগজে।

*　　*　　*

সর্ব ব্যাপারে সমালোচকদের শ্যেণ দৃষ্টি আমার ওপর নিবদ্ধ কেন? ছিদ্রান্বেষীরা এত কেন তৎপর শুধু আমার খুঁত ধরতে? রবীন্দ্রনাথের গান কোথায় স্বরলিপি বহির্ভূত সুরে গাইলাম, সেটাও ঐ একটিমাত্র বাংলা কাগজে পাঠকের চিঠির বিষয়। আরও কত কী!

আমার শারীরিক বৈশিষ্ট্য নিয়েও দু একটি লিট্‌ল ম্যাগাজিনে নিবন্ধ লেখা হয়েছিল।

কারা এত রেগে যাচ্ছিলেন? এত মরিয়া হ'য়ে উঠেছিলেন আমাকে অপদস্থ করার জন্য? টিকিট ব্ল্যাকার, গুণ্ডা, দাগী আসামী, ছাতুঅলারা, 'ছাতা-সারাবে' বলে যাঁরা ঠা ঠা রোদ্দুরে হেঁটে যান কলকাতার পথ ধরে, ফেরিঅলারা, বস্তিবাসীরা, লটারির টিকিট-বিক্রেতারা? কারা? নাকি —

*　　*　　*

সকাল সাতটায় আমাদের টেলিফোন বেজে উঠল। আমাদের এক আত্মীয় ধরলেন। আঁৎকে উঠে রেখে দিলেন। ঐ সাতসকালে কোনো এক বাঙালি ভদ্রমহিলা ফোন ক'রে জানতে চাইছিলেন' :

'কি রে, সুমন বুঝি এখন হাগতে গেছে?'

নাম বলেননি।

কে তিনি? তিনি কি কাগজ কুড়িয়ে বেড়ান? ভিখারিনী? সস্তার যৌনকর্মী, যিনি বাধ্য হন দেহ বিক্রি করতে, ঠিক যেমন আমি অনেক কিছু জেনেশুনেও আজও বাধ্য হই জনসমক্ষে আমার কণ্ঠ বেচতে, বাজনার হাত দুটো বেচতে, মঞ্চে আমার শরীর, ব্যক্তিত্ব বেচতে?

কে তিনি? নিশ্চয়ই তিনি অত সকালে পাবলিক বুথ থেকে টেলিফোন করছেন না? বাড়িতেই আছে তাঁর টেলিফোন। অথবা কোনো দপ্তরে।

*　　*　　*

১৯৮৮ সাল। কোলনের একটা রাস্তা ধরে হাঁটছি। গরমকাল। একটা দোকানের বাইরে ছোট্ট একটি মেয়ে বসে আছে। জার্মান মেয়ে। বয়স বড়জোর চার-পাঁচ। ফিক্ করে হেসে আমায় কাছে ডাকল। তার বাবা-মা হয়ত দোকানের ভেতরে। মেয়েটা হাসিমুখে জিজ্ঞেস করল ঃ

—"তুমি বুঝি তুরস্কের লোক?"

—"না, কলকাতার।"

বোঝাতে হ'ল কলকাতাটা কোথায়।

—"তোমার ভাষায় কিছু বলো আমাকে।"

—"আমি তোমায় ভালবাসি।"

—"মানে কী?"

জার্মান ভাষায় অনুবাদ ক'রে দিলাম। মেয়েটি হাসিতে, আনন্দে উজ্জ্বল হয়ে বলল — "তোমাদের ভাষা কী সুন্দর!"

তার গালে একটা চুমু খেয়ে আমার প্রস্থান।

"I met a young girl
she gave me a rainbow." — Bob Dylan

১৯৯৬ সাল। সেপ্টেম্বর মাস। সোনারপুর থেকে অষ্টম শ্রেণীর এক ছাত্রর টেলিফোন :

"কাকু, তোমার গান আমি আগে কখনও শুনিনি। 'ছোটবড় মিলে'-তে প্রথম শুনলাম। কাকু, তুমি এমন গান লেখো কী ক'রে? বড়দের জন্য তো অনেক লিখলে, এবার আমাদের জন্য লেখো, আরো গান লেখো...."

"Where have you been
my blue eyed son
Where have you been
my darling young one?"

— Bob Dylan

"তুমি না থাকলে সকালটা এত মিষ্টি হত না
তুমি না থাকলে মেঘ ক'রে যেত বৃষ্টি হত না"

— অঞ্জন দত্ত

* * *

১৯৯৫ সাল। সম্বর্ধনা দিতে চাওয়া বাংলা কাগজে একটা ভুয়ো খবর বেরোল ঃ আমি নাকি কোন অনুষ্ঠানে ঘোষণা করেছি যে আমি আর কোনো উদ্যোক্তার অনুষ্ঠানে গাইব না।

না। এমন কোনো ঘোষণা আমি করিনি কোথাও। করতে পারি না। কারণ আমি পেশাদার গায়ক, মঞ্চশিল্পী। উদ্যোক্তাদের অনুষ্ঠানে পারিশ্রমিকের বিনিময়ে গান গেয়ে আমি সংসার চালাই।

একটি একক অনুষ্ঠানে আমি দুঃখ করে বলেছিলাম যে আমি খুব বেশি পারিশ্রমিক নিই না, তাও কোনো কোনো উদ্যোক্তা টিকিটের দাম এত বেশি করেন যে আমার খারাপ লাগে। স্বভাবসিদ্ধ ভঙ্গিতে আমি শ্রোতাদের কাছে প্রশ্ন রেখেছিলাম — আমি যদি মাঝে মাঝে নিজেই নিজের একক অনুষ্ঠান প্রযোজনা করি এবং সরকারের বেঁধে দেওয়া দামে টিকিট করি তো কেমন হয়। একক অনুষ্ঠান। এবং মাঝেমাঝে নিজের প্রযোজনা।

ঐ বিকৃত খবরটির ফলে কী কী হল? অনেক উদ্যোক্তা নিশ্চয়ই খবরটাকে সত্যি ভেবে (কাগজে যখন ছাপা হয়েছে) শিল্পীতালিকা থেকে

আমাকে বাদ দিলেন। অর্থাৎ একটা খবরকাগজ নিজের থেকে, বদমাইশি ক'রে আমার পেশায় হস্তক্ষেপ করল। চমৎকার! একেই তো বলে সাংবাদিকতার স্বাধীনতা, কি বলুন!

ব্যারাকপুর এলাকায় দুই উদ্যোক্তা-সমিতির মধ্যে, বিরোধ, বচসা, ব্যানার ছেঁড়াছিঁড়ি হয়ে গেল। বাংলা কাগজের ঐ ভুয়ো খবর প'ড়ে একদল অন্য দলকে বলল — এই তো কাগজে বেরিয়েছে, সুমনদা নিজেই বলেছেন যে আর অনুষ্ঠান করবেন না। তোমরা নিশ্চয়ই মিথ্যে কথা ব'লে টিকিট বিক্রি করছ!

এর দায়িত্ব কি ঐ কাগজ বা কোনো সাংবাদিক নেবেন? বিনা কারণে কিছু নিরীহ সাধারণ যুবকের ক্ষতি হ'ল, আর আমার হ'ল পেশাগত ক্ষতি। ঐ যুবকরা বা আমি কিন্তু ঐ পত্রিকাটির কোনো ক্ষতি করিনি।

ঐ ঘটনার পর আমি পত্রিকাটিকে জানিয়ে দিলাম যে সম্বর্ধনা-টম্বর্ধনার আর প্রশ্নই ওঠে না, আমি ওসবে নেই।

* * *

সম্বর্ধনা বাতিল ক'রে দেওয়ার কয়েকদিনের মধ্যেই পত্রিকার এক বয়স্ক সাংবাদিক, যাঁর ১৯৯২ সাল থেকে আমাদের বাড়িতে যাতায়াত ছিল, আমার কাছে এলেন একটি চেক হাতে। আমার একটি বই-এর রয়্যালটি আমি দান করেছিলাম একটি শ্রমিক আন্দোলনকে। তার আগেও আমি বহু টাকা নিজেও দিয়েছি, গান গেয়ে গেয়ে তুলেও দিয়েছি। বিনা পারিশ্রমিকে।

বয়স্ক সাংবাদিকটি এসে জানালেন, ঐ আন্দোলন আর আমার টাকা নিতে চান না। ইস্ এইভাবে যদি আমার দেওয়া আরও কিছু টাকা ফেরত পেতাম! আহা বুড়ো বয়সটা একটু নিশ্চিন্তে কাটানো যেত, কি বলুন।

আরও কত সহৃদয় মানুষ যে কত টাকা দিয়েছেন!

* * *

আমি অনুমান করছিলাম যে কিছু একটা ঘটতে চলেছে। বেশ গুছিয়ে তোড়জোড় করছে কোনো কোনো মহল। আজিজুলদা এসে বললেন : সম্বর্ধনাটা তুমি নাও। প্রথমে তো হ্যাঁ বলেছিলে। এখন তবে না বলছ কেন?

বুঝিয়ে বললাম।

আজিজুলদা, তোমার মনে আছে তো? নিশ্চয়ই মনে আছে, বলো? এমন কিছু পুরনো ঘটনা তো নয়। ১৯৯৫ সালের এপ্রিল মাস। "ওরা তোমায় এন্‌সার্ক্‌ল্ করবে সুমন।"

* * *

৮ই মে, ১৯৯৫। কলামন্দিরে একটি একক অনুষ্ঠান। শুনলাম শ্রী শংকরলাল ভট্টাচার্য সেখানে উপস্থিত। একটি বিশেষ পত্রিকায় আমার ও আমার সহশিল্পীদের ব্যঙ্গচিত্রসমেত একটি কুৎসিত ফিচার বেরিয়েছিল। সুপরিকল্পিতভাবে লেখা। আবার আমাদের পেশার উপর আক্রমণ। একজন 'কণ্ঠশিল্পী' (?) সেই ফিচারের লেখককে বলেছিলেন — 'আপনার তো দেখছি দাড়ি আছে, আপনিও গান গাইতে শুরু করুন না!'— এতদূর যেতে পারে ঈর্ষা, বদমাইশি। নতুন ধারার গানের কোনো ভবিষ্যৎ নেই, এই মর্মেও কিসব বলেছিলেন তিনি। ত্রিকাল-দ্রষ্টা ব্যক্তি!

শংকরলালবাবুকে সামনে পেয়ে (তাঁর সঙ্গে আমার পরিচয় নেই, শত্রুতা তো দূরে কথা) আমি একাধিকবার গানের ফাঁকে ফাঁকে বললাম — 'শংকরলালবাবু, আপনাদের পত্রিকা সুপরিকল্পিতভাবে আমাদের অপমান করে; আজ আমিও সুপরিকল্পিতভাবে আপনাকে অপমান করব।' অথচ অপমানজনক কিছুই বলিনি তাঁকে। একটাও খারাপ কথা বলিনি। বলেছিলাম — 'আপনার কর্মদাতাকে আমার নমস্কার দেবেন এবং তাঁকে বলবেন যে তাঁর পত্রিকা সত্ত্বেও নতুন ধারার গান বেঁচে থাকবে।'

বিরতির সময়ে একজন এসে বললেন শংকরলালবাবুর মেয়ে কষ্ট পেয়েছে। বিরতির পর দ্বিতীয়ার্ধে আমি শুরুই করলাম 'ক্যাকটাস তুমি কেঁদো না' গানটি দিয়ে। গাইতে গাইতে আমি সেই মেয়েটিকে সরাসরি উদ্দেশ্য ক'রে বললাম — আমারও মেয়ে আছে, অঞ্জনের ছেলে আছে, মৌসুমীরও। আমাদের পরিবারেও স্বামী আছে, স্ত্রী আছে। আমাদের ছেলেমেয়েদেরও কষ্ট হয় তারা যখন কাগজে তাদের বাবা-মা-দের ব্যঙ্গচিত্র দেখে এবং ঐসব কুৎসিত কথা পড়ে। মেয়েটিকে মনে করিয়ে দিলাম, তার বাবা সম্পর্কে আমি একটিও খারাপ কথা বলিনি। এও বললাম, যে তাঁর কর্মদাতার ওপরেও আমার তেমন রাগ নেই। বড়দের বিবাদে তোমরা ছোটরা থেকো না। বড়রা কেমন যেন হোঁৎকা হয়ে যায়। এসো, তার চেয়ে আমরা সবাই মিলে আমাদের সাধারণ শত্রু হিন্দি সাম্রাজ্যবাদকে আক্রমণ করি।

থেকে থেকেই তুমুল হর্ষধ্বনি করছিলেন শ্রোতারা।

অনুষ্ঠানের পর একটি কিশোরী মঞ্চের পাশে এসে আমার সঙ্গে হাত মিলিয়ে গেল নীরবে। আমার অনুমান, সেই মেয়েটি।

* * *

অনতিবিলম্বেই সম্বর্ধনা-দেনেওয়ালা পত্রিকায় অদ্ভুত সব চিঠি বেরোতে লাগল। অধিকাংশ চিঠিই মিথ্যে অভিযোগ ভরা। কেউ লিখলেন আমি নাকি রবীন্দ্রনাথকে নিয়ে ঠাট্টা করেছি। আশ্চর্য, আমি সেদিন উল্লেখ করেছিলাম

যে এমনকি দ্বিজেন্দ্রলাল রায়ও একসময়ে রবীন্দ্রনাথকে বিদ্রুপ করে কলম ধরেছিলেন। দ্বিজেন্দ্রলালের লেখা থেকে উদ্ধৃতি দিয়েছিলাম আমি।

অন্যান্য অনেক একক অনুষ্ঠানের মতো সেই অনুষ্ঠানেও শ্রোতারা আমার সঙ্গে গলা মিলিয়ে রবীন্দ্রনাথের গান গেয়েছিলেন। আমার শ্রোতারা এটা অনেককাল যাবৎ করে আসছেন। তার উল্লেখ কিন্তু কোনো চিঠিতে থাকেনি, থাকে না।

এক অভিনেতা পত্রিকায় চিঠি লিখে জানালেন যে আমি নাকি ৬৫ জন ভাড়াটে লোক নিয়ে গিয়েছিলাম। সেদিনও প্রেক্ষাগৃহ পূর্ণ ছিল। তাহ'লে বাকি লোকদের ভাড়া করল কে?

শ্রীমতি দিপালী নাগ সম্পর্কেও মিথ্যে কথা রটানো হল চিঠিতে। তিনি অবশ্য তার প্রতিবাদ করেন।

আর শংকরলালবাবুর ব্যাপারে তো চিঠির পর চিঠি। একটি চিঠিতেও সত্যি কথা লেখা হয়নি। আশ্চর্য, শংকরলালবাবু যে সংবাদপত্রগোষ্ঠীর সঙ্গে যুক্ত, সেই গোষ্ঠীর পত্রিকায় কিন্তু চিঠি বেরোল না। তাড়া তাড়া চিঠি বেরোল অন্য একটি কাগজে।

এক ভদ্রলোক আমার বাবার বন্ধু সাজলেন। বেচারি বাবা। বাবার কাছে কখনও তাঁর নাম শুনিনি। আমার মাও তাঁকে চেনেন না। সেই ভদ্রলোক এতই বন্ধু ছিলেন আমার পিতৃদেবের যে 'সুধীন্দ্রনাথ চট্টোপাধ্যায়' নামটিও তিনি জানতেন না। বাবার নাম তিনি প্রকাশিত চিঠিতে লিখলেন 'সুদিন'।

ইস্ আগে যদি জানতাম যে বাবার এমন সুহৃদ গড়িয়া স্টেশন রোডেই থাকেন তো ১৯৯৪ সালে বাবার স্মরণসন্ধ্যায় তাঁকে নেমন্তন্ন করতাম। আহ, পত্রিকায় ভাঁওতা-দেওয়া চিঠি-লেখা-কাকু, সুদিন চট্টোপাধ্যায়ের নামে আমরা আপনাকে একটু খাওয়াতাম। সে সুযোগ থেকে আমাদের আপনি বঞ্চিত করলেন।

* * *

বাবা, তোমার মনে নেই এইসব বন্ধুদের? 'ঘুমঘোরে মনোহরের' হঠাৎ আসার মতো একবার দুম ক'রে এসে তোমার ঐ বন্ধুটিকে জিজ্ঞেস ক'রে যেও : 'বন্ধু কি খবর বল, কতদিন দেখা হয়নি।'

* * *

একজন ভদ্রমহিলা একদিন টেলিফোন ক'রে খুব উদ্বিগ্ন কণ্ঠে জানালেন যে জনৈক অভিনেতা আমাকে ভয়ানক অপমান করার প্রস্তুতি নিচ্ছেন। তিনি বারবার বললেন — "ব্যক্তিটিকে আমি বিলক্ষণ চিনি, আপনারা খুব সাবধানে থাকুন।" অনেক পীড়াপীড়িতেও নিজের নাম বললেন না তিনি।

* * *

টেলিফোনের উৎপাত ঐ 'সম্বর্ধনামুখী'- পত্রিকার চিঠি-অভিযানের সঙ্গে সঙ্গে উল্লেখযোগ্য মাত্রায় বেড়ে গেল। নিপাট গালাগাল।

একাধিক পরিশীলিত কণ্ঠের অধিকারী পুরুষ খুব সুন্দর উচ্চারণ ক'রে শুধোতে লাগলেন আমিই সুমন কিনা। হ্যাঁ বলার সঙ্গে সঙ্গে কুৎসিত গালাগাল।

* * *

দোসরা মে, ১৯৯৫ তারিখে কলকাতার এক নামজাদা ক্লাবে আমার সম্বর্ধনা হবার কথা। সেটা বাতিল করলাম এপ্রিল মাসে। আটই মে, ১৯৯৫ তারিখে কলামন্দিরের তথাকথিত 'বিতর্কিত' অনুষ্ঠান। সেই বিষয়ে সমানে সুমনবিরোধী বনোয়াট বা অর্ধ সত্যে ভরা চিঠি একটি বিশেষ পত্রিকায় প্রকাশ। আহা, এঁরাই আমাকে সম্বর্ধনা দিতে চেয়েছিলেন মস্ত ক্লাবে।

আজিজুলদা তুমি বোধহয় আঁচ করেছিলে, তাই না? নয়তো অমন কাতর অনুরোধ করবে কেন সম্বর্ধনাটা নেবার জন্য? 'এন্‌সার্কল্‌ড' হবার কথাটাই বা বলবে কেন?

আমার ধারণা, তুমি অন্তত অস্বীকার করবে না, তাই তোমার নামটা দিলাম।

একটা মানুষকে বেমক্কা বিপদে ফেলার লক্ষ্যে কতটা সংঘবদ্ধ চেষ্টা হতে পারে আমাদের সমাজে? কতজন মানুষকে একযোগে কাজে লাগানো যায় এই চরম অকাজে? কত রকম মিথ্যে খবর দেওয়া যায়? কত ধরনের বিকৃতি সম্ভব? কত উপায়ে একজনকে হেয় প্রতিপন্ন করা যায়, অপদস্থ করা যায়?

"How many times can a man
turn his head
And pretend he just doesn't see?"

— Bob Duylan

* * *

একদিন লালবাজার থেকে খবর এল — একটি তদন্তের ব্যাপারে আমাকে অমুক অফিসারের সঙ্গে দেখা করতে হবে। গেলাম যথাসময়ে।

সেই অফিসারটি জিজ্ঞেস করলেন —"ফিল্ম লাইনে আপনার কি কোনো শত্রু আছে?"

না। ফিল্ম লাইনের সঙ্গে তখনও আমার তেমন যোগাযোগ নেই। এখনও নেই খুব একটা।

"আপনার বিরুদ্ধে অভিযোগ আপনি একজনের বাড়িতে টেলিফোন ক'রে গালাগাল দিয়েছেন। একদিনে আটবার।"

অমন আজগুবি অভিযোগ শুনলে হাসি পাবার কথা।

ভদ্রলোক বললেন, "আপনি যখন স্বীকার করছেন না তখন আপনাকে শ্রী গৌতম চক্রবর্তীর কাছে নিয়ে যাব।"

গৌতমবাবু একই অভিযোগ তুললেন। তাঁকে জানালাম, আমি জানি যে এটা হতে পারে না, কারণ আমি কাউকে টেলিফোনে গালাগাল দিই না। দরকার হলে সামনেই দিই। দু'টি পত্রিকা আমার সম্পর্কে যাচ্ছেতাই লেখার পর আমি প্রকাশ্য মঞ্চে তাদের গালাগাল দিয়েছি দু'বার। সেজন্য টেলিফোন দরকার হয়নি।

আমি তাঁকে বললাম — আপনাদের তো 'লাই ডিটেকটর' (মিথ্যে কথা ধ'রে ফেলার যন্ত্র) আছে, তাতে চড়ান না আমাকে।

তিনি বললেন — সুমনবাবু, আপনার ব্লাডপ্রেসার মাপা হবে, আরও অনেক কিছু করা হবে, আপনার কি ভালো লাগবে?

আমি তাঁকে বললাম — এখন যা করা হচ্ছে, সেটাও কি ভালো লাগছে আমার?

গৌতমবাবু বারবার বলতে লাগলেন — একদিনে আটবার আপনার নম্বর ধরা পড়েছে।

এটাই তো সবচেয়ে উল্লেখযোগ্য ঘটনা। আমি একদিনে আটবার কাউকে টেলিফোন করে বিরক্ত করেছি? একটু বেশি হয়ে গেল না?

আমি বললাম — আমায় চার্জশিট দিন।

উনি দিলেন না।

গৌতমবাবু আমায় হুঁশিয়ার করে দিলেন — আপনাকে আমরা 'অবজারভেশনে' রাখছি। এরপর আমরা স্টেপ নেব।

আমি তাঁকে বললাম — আপনি তো কোয়েসলারের লেখা 'ডার্কনেস্ এ্যাট নুন' (Darkness at Noon) পড়েছেন। আমার ঠিক সেরকম লাগছে। আমি জানি, গৌতমবাবু, যে এ-কাজ আমি করিনি। এটাই হ'ল সমস্যা।

অনেকক্ষণ কথা হয়েছিল। আপনার নিশ্চয়ই মনে আছে গৌতমবাবু? আপনার নিশ্চয়ই এটাও মনে আছে যে কার বাড়িতে আমি টেলিফোন করেছি, কাকে গালাগাল দিয়েছি, তা আপনি আমায় বলেননি। আমিও আপনাকে জিজ্ঞেস করিনি।

পুরো ব্যাপারটাই ফ্রান্‌ৎস কাফকার উপন্যাসের মতো।

শেষমেশ গৌতমবাবুকে আমি বললাম — আমি জানি এইসব কাজ আমি করিনি, আমার বিবেক পরিষ্কার, তথাপি যাঁর বাড়িতে উৎপাত হয়েছে তাঁকে জানিয়ে দেবেন যে তাঁর ঐ অবস্থার জন্য আমি দুঃখিত।

সে-বেচারির অবস্থা আমি বেশ ভালোই উপলব্ধি করতে পারি, কারণ ১৯৯২ সাল থেকে আজ পর্যন্ত আমার বাড়িতেও এ-উপদ্রব ঘটে চলেছে।

ঘর থেকে বেরোতে যাব, এমন সময় একজন পুলিশ কর্মচারী গৌতমবাবুকে এসে জানালেন যে বাইরে ফোটোগ্রাফাররা অপেক্ষা করছেন। গৌতমবাবু আমায় বললেন, একটু বসুন। বাইরে কাগজের লোক আছে।

আমি বললাম — তাতে কী? আমার তো লুকনোর কিছু নেই। সাংবাদিকদের তো প্রশ্ন করার অধিকার আছে।

গৌতমবাবু বললেন — আপনারও অধিকার আছে কিছু না বলার।

মনে আছে তো গৌতমবাবু এসব কথা? এত বড় ঘটনা, আপনি ভোলেননি নিশ্চয়ই।

আমি তাঁকে জিজ্ঞেস করলাম — এইসব রিপোর্টার ফোটোগ্রাফারদের কি আপনারাই ডেকেছেন?

তিনি একটু বিব্রত হয়ে বললেন — আপনার বিরুদ্ধে যারা অভিযোগ এনেছে, তারাই হয়তো খবর দিয়েছে এদের।

এই কথাটা আপনি অমন সরাসরি বলেছিলেন ব'লে আমি কৃতজ্ঞ থাকলাম আপনার কাছে।

আপনি একজন সার্জেন্টকে বললেন বেরনোর সময় আমার সামনে থাকতে। সেই সার্জেন্ট ভদ্রলোক প্রাণপণ চেষ্টা করলেন নির্দেশ পালন করতে। ঘর থেকে বেরোতেই অসংখ্য ফ্লাশগান্ ঝল্‌সে উঠতে লাগল। সার্জেন্ট বেচারি মরিয়া হয়ে আমার সামনে। ফলে ফোটোগ্রাফার ভদ্রলোকদের মহা অসুবিধে। তাঁরা খালি ফাঁকফোঁকর খুঁজছেন। ছবি তুলেছেন। কিন্তু ভালো ছবি পাচ্ছেন না। বেচারিদের ফিল্ম খামোখা নষ্ট হচ্ছে। শেষকালে সিঁড়ি দিয়ে নেমে আমি সার্জেন্টকে বললাম — দেখুন ভাই, এ-বেচারিদের বোধহয় পত্রিকা-আর্কইভে আমার ভালো ছবি নেই। একটু পোজ দিয়ে দাঁড়াই, এরা বরং ছবি তুলে নিক।

একটা কাঠের দরজার পাশে আমি দাঁড়িয়ে বললাম — নিন ভাই, ছবি তুলুন যত চান।

ফোটোগ্রাফাররা পাগলের মতো ছবি তুলতে লাগলেন। তাঁদের মুখগুলো আর হাবভাব দেখে মনে হচ্ছিল হাতে ক্যামেরার বদলে বন্দুক থাকলে তাঁরা বেশি সুখ পেতেন। এ-যেন ফায়ারিং স্কোয়াডের সামনে দাঁড়িয়ে একজন। কিলারদের হাতে শুধু রাইফেলের বদলে ক্যামেরা।

আর একটা মিল। রাইফেল আর ক্যামেরার ফ্লাশগান দুটোই ঝলসে ওঠে।

সার্জেন্ট ভদ্রলোক ভীষণ বিব্রত। অতজন ফোটোগ্রাফার, রিপোর্টার, রাস্তার লোক। তাদের মধ্যে বিব্রত শুধু একজন মানুষ। চোখের কাছাকাছি নামিয়ে আনা তাঁর টুপিটা তাঁকে একটু সাহায্য করছিল বোধহয়। মনে

হচ্ছিল, তিনি যেন লজ্জা পাচ্ছেন, চোখ ঢাকছেন টুপির সামনের দিকটায়। ঋজু দেহ। বলিষ্ঠ দাঁড়ানোর ভঙ্গি। কিন্তু মুখটা একটু নত।

ভাই, আপনার নামটা সেদিন জানা হয়নি। কিন্তু আপনার লজ্জিত, বিব্রত তরুণ মুখটি আমার মনে থাকবে।

* * *

সেদিন সন্ধেবেলা ছিল রবীন্দ্রসদনে চিন্ময় চট্টোপাধ্যায়ের স্মরণসভা। লালবাজার থেকে বাড়ি ফিরে রবীন্দ্রসদনে গেলাম। গান গাইলাম।

বাড়ি ফিরে শুনি বর্তমান কাগজ থেকে ফোন করা হয়েছিল। অন্য এক বাংলা পত্রিকার যে বয়স্ক সাংবাদিক আমায় চেক দিয়ে গিয়েছিলেন, তিনি এলেন। হাসি হাসি মুখে। চার বছর ধ'রে তিনি এই মুখটি নিয়েই এসেছেন আমাদের বাসায়।

তাঁর সামনেই একটি ইংরিজি পত্রিকা থেকে ফোন এল। একজন মহিলা (সাংবাদিক) আমায় প্রথম জানালেন, কোন ব্যক্তি আমার বিরুদ্ধে অভিযোগটা এনেছেন। তিনি একজন অভিনেতা, যাঁর সঙ্গে কোনোদিন বাক্যালাপ হয়নি আমার। পরিচয়ও হয়নি। পুলিশ কিন্তু এঁর নাম বলেননি আমাকে। এই সাংবাদিকটি টেলিফোনে বললেন। আমি তাঁকে বললাম — অভিযোগটা সম্পূর্ণ মিথ্যে। আরও কিছু কথা হ'ল।

হাসি হাসি মুখ বয়স্ক সাংবাদিক 'আরে-এ-তো-জানা-কথা' গোছের মুখ ক'রে আমার কথাগুলি শুনলেন এবং বলতে লাগলেন — 'দ্যুৎ, কোনো মানে হয় এসবের।'

মহিলা সাংবাদিককে আমি বললাম টেলিফোনে কাউকে গালাগালও দিইনি, ভয়ও দেখাইনি। আমাকে কিন্তু লোকে সারাক্ষণ টেলিফোনে গালাগাল দিয়ে যাচ্ছে এত বছর। এ আর এমন কি ব্যাপার!

ভদ্রমহিলা বললেন — আপনি যে বিখ্যাত মানুষ, তাই এসব হচ্ছে।

হাসিখুশি বয়স্ক সাংবাদিকটি বিদায় নিলেন আমার সব কথা শুনে।

পরের দিন কাগজে কাগজে সবাই সচিত্র খবর পড়লেন। ঐ ইংরিজি পত্রিকাটিতেও কিন্তু আমার দিকের কোনো কথা ছাপা হ'ল না। উল্টে বেরোল যে আমি নাকি আমার সহশিল্পীদের সম্পর্কে কটূক্তি করে থাকি। এ-তথ্যের সত্যতা বিষয়ে আমার সহশিল্পীরা ও শ্রোতারা নিশ্চয়ই ওয়াকিবহাল।

* * *

একটি বাংলা কাগজেও আমার কোনো মত বা মন্তব্য ছাপানো হয়নি। কেউ আমার প্রতিক্রিয়া জানতেও চাননি। একতরফা আক্রমণ চলল।

* * *

অনেক রাতে বন্ধু, উচ্চপদস্থ পুলিশ অফিসার আয়ান রশিদ খান ফোন করেছিলেন। তিনি এসবের কিছুই জানতেন না। 'এশিয়ান এজ' পত্রিকা থেকে তাঁকে কেউ জানান ঘটনাটা। রশিদ তখন মহা ব্যস্ত হয়ে ফোন করেন আমায়।

তার পরেই ঐ পত্রিকা থেকে একজন ফোন করলেন। তিনি আমায় বললেন — ঘটনাটা যে আজ ঘটবে আমাদের পত্রিকা জানত না। জানলে আমাদের সাংবাদিকও থাকত লালবাজারে।

এই ইংরিজি পত্রিকাটির সাংবাদিককে আমি অনেক রাত পর্যন্ত টেলিফোনে পুরো ঘটনাবৃত্তান্ত জানালাম। পুলিশ কিভাবে আমায় ডেকে নিয়ে গেছে, কী কী হয়েছে ইত্যাদি। একমাত্র এই ইংরিজি পত্রিকাতেই আমার প্রতিক্রিয়া, মতামত কিছুটা ছাপা হয়েছিল।

* * *

পত্রিকার কেচ্ছার বন্যা দেখে আমাদের বাসায় এসেছিলেন শ্রীমতি মাধবী মুখোপাধ্যায়, গ্রামোফোন কম্পানির শ্রী সুব্রত চৌধুরী, বন্ধু ডাক্তার স্থবির দাশগুপ্ত, আমার আয়কর-সংক্রান্ত উকিল শ্রী রঘুনাথ ঘোষ। রঘুনাথ সন্ধেবেলা এসেই বললেন — 'আপনার উচিত আইনের সাহায্য নেওয়া, আমি আপনাকে ভালো উকিলের খোঁজ দিতে পারি।'

রঘুনাথ আমায় অনেক সাহায্য করেছেন।

মাধবীদি দিয়েছেন নৈতিক সমর্থন। তিনি পাশে থেকেছেন। সুব্রতবাবু আমায় বলেছিলেন — 'দাদা, গ্রামোফোন কম্পানিকে যে আপনি কত ব্যবসা দিয়েছেন তা আপনি নিজেও জানেন না। আমরা আপনার পাশে আছি।'

আমাদের দুঃসময়ের এই বন্ধুদের কখনও ভুলব না।

অন্য অনেকের দুঃসময়ে বা নানান প্রয়োজনে আমার কণ্ঠ, আমার সঙ্গীত, আমার শ্রম, আমার কষ্টার্জিত অর্থ, ব্যবহৃত হয়েছে। বারবার। অনেকবার। তাঁদের টিকিটিও দেখতে পাইনি আমরা আমাদের দুঃসময়ে।

"Hey, that's no way to say goodbye"

— Leonard Cohen

* * *

মানুষের জীবনে অঘটন জরুরি বোধহয়। অনেক মানুষকে চিনে নেওয়া যায়।

* * *

আজিজুলদা বার দুই ফোন করেছিলেন। আমি দেখা করিনি। ও-বেচারিকে আর জড়িয়ে কী লাভ?

* * *

একজন ভদ্রলোক একদিন ফোন ক'রে আমায় আমারই গান গুনগুন করে গেয়ে শুনিয়ে দিলেন : "বন্ধু তুমি কেঁদো না, আমারও কান্না আছে, কাঁদিনা তোমারই জন্য, তুমি ভেসে যাও পাছে।"

নাম জিজ্ঞেস করতেই ফোন রেখে দিলেন। দুঃসময়ের বন্ধু, তুমিও কেঁদো না।

* * *

নচিকেতা চক্রবর্তী একদিন ফোন ক'রে বললেন — 'দাদা, তুমি কিছু বলছ না কেন? যে যা ইচ্ছে তাই বলছে, লিখছে। তুমি বলছ না কেন— যা করেছি বেশ করেছি। এই নে দশ হাজার টাকা। আরও দশ হাজার টাকা তোকে দিচ্ছি আবার তোকে খিস্তি করব ব'লে।'

ভীষণ রেগে গিয়েছিলেন নচিকেতা। পবিত্র রাগ। আমি এই ডানপিটে যুবককে শান্ত করে বলেছিলাম — কিন্তু সমস্যা হ'ল নচি, অভিযোগগুলি মিথ্যে।

* * *

পরে মনে হয়েছে, নচিকেতা ভুল বলেননি। যে সমাজে এরকম কাণ্ড ঘটে, সেখানে এমন মনোভাবটাই হয়তো কাজে লাগে।

* * *

আমাদের টেলিফোন নম্বর অনেক কাগজে ছাপিয়ে দেওয়া হল। ফলটা কী হ'ল তা কাগজকুমাররা নিশ্চয়ই জানেন। কারণ এ-কাজটা তাঁরা ভেবেচিন্তেই করেছেন।

খিস্তি ও হুমকির বন্যা বয়ে গেল। আমার মেয়েকে মেরে ফেলার হুমকিও দিতে লাগল কারা যেন। পুলিশকে জানাতে বাধ্য হলাম। টেলিফোন ট্যাপ করানো হ'ল। খিস্তি ও উৎপাত চলতে লাগল। কিন্তু কই, কেউ তো ধরা পড়ল না! আমার বাড়িতে যারা টেলিফোনে এত উপদ্রব ক'রে গেল তাদের ছবি, পরিচয়, টেলিফোন নম্বর তো বেরোল না কোনো খবরকাগজে।

তাহ'লে কী ধ'রে নেব হুজুর? আপনাদের অনুমতি নিয়ে কি ধ'রে নিতে পারি যে প্রশাসন, পুলিশ, কাগজ, রাজনৈতিক দল — অনেকেই এই চক্রান্তের সঙ্গে যুক্ত?

* * *

আমি অনুমান করতে পারি, এই লেখাটার জন্য কী কী ঘটতে পারে, আবার কী কী ঘটানো হতে পারে। আমার ব্যাপক চরিত্রহনন। আজকাল নানান যন্ত্র ব্যবস্থা কত উন্নত যে যান্ত্রিক উপায়ে যে-কোনো লোককে ফাঁসিয়ে দেওয়া যায়, বিশেষত আমাদের মতো এমন দেশে।

গলা নকল করানো যায়। বিভিন্ন ছবি মাউন্ট করে ইচ্ছেমতো নানান রূপ দেওয়া যায়। হাতের লেখা, সই নকল করা যায়।

কোনো-না কোনো ছিদ্র ধ'রে আবার চক্রান্ত করা সম্ভব। চাই কি, দু একটা একসিডেন্ট!

হবেও বোধহয়।

*　　*　　*

এক অভিনেতা-পরিচালক তাঁর ছবির ব্যাপারে আমার সঙ্গে কথা বলতে এসে জানালেন — 'আপনাকে চুপ করানোর জন্যেই এত কিছু।'

"কত লোককে যে জবাবদিহি করতে হচ্ছে — কেন আপনাকে আমার ছবির সঙ্গীত পরিচালক হিসেবে নিলাম"— বললেন শ্রীমতি মাধবী মুখোপাধ্যায়।

*　　*　　*

১৯৯৪ সাল। এক সন্ধেবেলা ঢাকুরিয়া ব্রিজের কাছে একটি গাড়ি আমাদের গাড়িটাকে ধাক্কা মেরে বেরিয়ে যায়। আমার সহকারী মণিশংকর সেই গাড়ির ড্রাইভারকে ধ'রে ফেলে তাঁকে বলেন গাড়ি থেকে নেমে আসতে। আমার এক বন্ধু ও মারিয়াও ছিলেন গাড়িতে। দু'টি গাড়িই তখন ঢাকুরিয়া ব্রিজে। ও মা, কোত্থেকে কতগুলো লোক ছুটে এসে মণিশংকর আর সুজয়কে মারতে লাগল। আমাকে কেউ দেখতেও পায়নি। চিনতে পারা তো দূরের কথা। অনেক চেষ্টা করলাম গোলমাল থামাতে। আমার কথা কেউ কানেই নিল না। পুলিশ এল। আমি ততক্ষণে একজন গুণ্ডাকে ধরে ফেলেছি। কয়েকজন রেলিং টপকে পগারপার। লেক থানায় লোকটাকে নিয়ে যাওয়া হ'ল। থানার বড়বাবু বললেন — এরা সব স্থানীয় দুর্বৃত্ত। তক্কে তক্কে থাকে। ঢাকুরিয়া ব্রিজে গাড়ি নিয়ে কিছু হ'লেই এরা ঝামেলা করে এবং টাকা নেয়।

পুলিশ গিয়ে অল্প সময়ের মধ্যে বাকি গুণ্ডাদেরও ধরে আনল। আমি তাদের বললাম —'ওরকম করলেন কেন আপনারা? অন্য গাড়িটা আমাদের গাড়িটাকে মারল। আপনাদের সঙ্গে তো কোনো বিরোধ ছিল না। তা আপনারা হঠাৎ উড়ে এসে আমার বন্ধুদের মারতে লাগলেন, আমার কথা শুনলেনই না।' লোকগুলো মাফ চাইতে লাগল। বড়বাবু বললেন, 'এরা ভালো কথা বোঝে না। প্রায়ই ঝামেলা করে। আজ ফেঁসে গেছে।' মণিশংকর ডায়রি করলেন।

পরের দিন একটি বাংলা দৈনিক পত্রিকায় প্রথম পাতার খবর হ'ল— রবীন্দ্রভক্তদের হাতে রবীন্দ্রবিরোধী শিল্পী লাঞ্ছিত। আমি নাকি রবীন্দ্রনাথের বিরুদ্ধে কিসব বলেছি তাই রবীন্দ্রভক্তরা আমাকে আক্রমণ করেছেন। আমি সেই আক্রমণ প্রতিহত করেছি।

চমৎকার!

এই হ'ল তাহ'লে আমাদের সাংবাদিকতা। এমন কি হ'তে পারে যে ভুয়ো খবরটা ভেবেচিন্তেই দেওয়া হয়েছে? অর্থাৎ, এই 'রবীন্দ্রবিরোধী' লোকটাকে রাস্তায় মারা যেতে পারে। তার সঙ্গে তার স্ত্রী থাকলেও সক্কলের ওপর হামলা করা যেতে পারে। একে, এদের মারো! — এই সংকেতটাই কি দেওয়া হ'ল?

ঐ পত্রিকার সাংবাদিকরা বা সম্পাদক লেক থানাতেও খবর নেননি। নিলে এমন ভয়ানক গল্প ফাঁদতে পারতেন না। নাকি নিয়েছিলেন?

কী করবেন ভায়েরা। এবারে কোন গল্প ফাঁদবেন ব'লে ঠিক করলেন? ভাবতে থাকুন একটা-না-একটা আষাঢ়ে গল্প বেরোবেই আপনাদের উর্বর মস্তিষ্ক থেকে।

আমার আত্মীয়স্বজন, বন্ধুবান্ধবদের কথা ভাবুন একবার। আপনাদের বানানো এই মিথ্যে, ভয়ঙ্কর মিথ্যে খবরটা প'ড়ে তাঁদের মনের অবস্থা কী হয়েছিল?

কতগুলো অপকর্ম একসঙ্গে ক'রে বসলেন মাথা খাটিয়ে। ভাববেন একবার?

আমি তো আপনাদের কোনো ক্ষতি করিনি! তাহ'লে এগুলো করলেন কেন?

ও হ্যাঁ, সেইসঙ্গে আপনারা,— আমাকে রবীন্দ্রবিরোধী বানাতে গিয়ে এবং আমাকে পরবর্তী শারীরিক আক্রমণের জন্য হাজির করতে গিয়ে, রবীন্দ্রভক্তদের যে গুণ্ডাও বানিয়েছিলেন!

*　　*　　*

কল্যাণ বন্দ্যোপাধ্যায়ের লেখা একটি পদ্য। শিরোনাম : 'মার শালাকে।'—

হিমেল ঘরে
দারুণ ভালো
সুমন শোনায়
ভীম পলাসী
পাশের সিটে
দারুণ ভালো
সুগন্ধতে
এলোকেশী।
একটু পরে
দারুণ ভালো
কেমন যেন
লাগছে শীত।
কাঁপতে কাঁপতে
আসছে বোধহয়
হিমঘরেরই
এমন গীত।
হাসপাতালের
বরফ ঘরের
ঘুরে আসা
বদ্ধ হাওয়া।
নাক কুঁচকে

আসছে বমি
বলছে সবাই
বাহা বাহা।
সুমন ভায়া
গান শোনাও
মৃতদেহ
আমায় গোনাও,
বাতাস থেকে
বদ্‌বু হঠাও
লাগাও ভেল্কি
যাদু টোনাও।
একটু একটু
পচন ধরা
বিকৃত সেই
মুখগুলো।
হঠাৎ হঠাৎ
আসে কেন?
বলতে পারলে
মুখ খুলো।
হিম ঘরের
অন্ধকারকে
মনে কেন হয়
আস্ত মর্গ,
আম জনতা
চেঁচিয়ে ওঠে,
'মার শালাকে
এটাই স্বর্গ।'

*　　*　　*

কল্যাণ বন্দ্যোপাধ্যায়ের কাব্যগ্রন্থ 'দগ্ধ' প্রকাশিত হয় ১৯৯৫ সালে কলকাতা বইমেলায়। প্রকাশক : পরম্পরা।

কল্যাণ আমাকে বইটি পৌঁছে দেন। আমি তখন ব্যারাকপুরে অনুষ্ঠান করছি।

'মার শালাকে' পড়ে আমি অবাক হইনি। ১৯৯২ সাল থেকে তো আমি সব দেখে আসছি, চেখে আসছি, শুনে আসছি, জেনে আসছি, টের পেয়ে আসছি, আপনি, কল্যাণ, আপনি তো আমার জায়গায় ছিলেন না। আপনি এত ভালো

বুঝলেন কী ক'রে? শুধু আমার অনুষ্ঠানে গিয়ে? আমার, আমাদের চারদিকে কয়েক বছর ধ'রে যা যা হয়ে চলেছে (কখনও চুপিসাড়ে, কখনও প্রকাশ্যে), তার গন্ধ শুঁকে? মানুষের কথা শুনে? বাতাসের গতি দেখে? কাগজ প'ড়ে?

আপনি ঠিক ধরেছেন কল্যাণ। 'মার শালাকে।' আমার নাম শুনলে, পড়লে, এমনকি ভাবলেই অনেক প্রতিষ্ঠান, শিবির, মহল, গোষ্ঠী, ব্যক্তি ব'লে ওঠেন ঃ 'মার শালাকে'। —

লেখাটা পড়ছেন কেউ এখনও? যদি পড়েন এবং আগের বাক্যটির শেষে যদি প্রশ্ন ওঠে 'কেন', লক্ষ্মীটি, কল্যাণের পদ্যটা আর একবার পড়ুন। ভালো ক'রে পড়ুন। উত্তর পেয়ে যাবেন।

আম জনতা
চেঁচিয়ে ওঠে
'মার শালাকে
এটাই স্বর্গ।'

— কল্যাণ বন্দ্যোপাধ্যায়

* * *

কল্যাণ দিল্লি চ'লে গেছেন। ওখানে ওঁর স্ত্রী ও মেয়ে থাকেন। ওঁর মন কেমন করে 'দগ্ধ' কলকাতার জন্য। চিঠিতে 'ঠোঁট ফোলান।' কথাটা কল্যাণেরই।

কলকাতায় যেখানে থাকতেন, সেই এলাকার বেশ কয়েকটি ঝুপড়ি পুড়ে গেল কয়েক মাস আগে। কল্যাণ তখনও কলকাতায়। কাঁদতে কাঁদতে চিঠি দিলেন আমায়, "সুমন, আমার ঝুপড়িগুলো পুড়ে গেল।" আবার 'দগ্ধ' হতে হতে শেষবেশ দিল্লি চলে গেলেন। ভাববেন না কল্যাণ। ঝুপড়িগুলো আবার গজিয়ে উঠবে। আবার মানুষ বাসা বাঁধবে পথের ধারে। যাবে কোথায় বলুন তো?

তারপর হয়তো আবার আগুন লাগবে, কল্যাণ। আবার কোনো কোনো মা তাঁদের বাচ্চাদের ঘরে বন্ধ রেখে যাবেন, রোজগারের ধান্দায়। আবার সেই বাচ্চাগুলো পুড়ে মরবে। আবার আপনি 'দগ্ধ' হবেন, কল্যাণ। তারপর আবার। তারপর আবার। তবুও কবিতা লিখে যান। পোড়া পোড়া কবিতা, কল্যাণ, আমার পোড়া পোড়া কয়েকটা গানের মতো।

* * *

'প'-এ পোড়া, 'প'-এ পাপড়ি। পাপড়ি দে।

চিকিৎসাব্যবস্থা ও চিকিৎসকের অবহেলায় ছোট্ট মেয়ে পাপড়ি মারা গেল। নাকি খুন হ'ল?

একটি দৈনিক পত্রিকায় খবরটা প'ড়ে আমি একটা গান লিখেছিলাম ১৯৯৩ সালে। এখানে ওখানে গাইছিলাম।

এক সন্ধেবেলা পাপড়ির বাবা শ্রী মিহির দে এলেন আমাদের বাসায়। গানটি শুনতে চাইলেন। আমি তাঁকে শোনাইনি।

সেই থেকে মিহিরবাবুর সঙ্গে আমাদের সম্পর্ক। পাপড়ি-মামলার প্রতিটি শুনানির আগে মিহিরবাবু আমাদের খবর দিতে ভোলেননি। প্রতিবারই শুনানির দিন পিছিয়ে গিয়েছে। বেচারা পাপড়ি। বেচারা মিহিরবাবু ও তাঁর স্ত্রী।

* * *

১৯৯৬ সালের গ্রীষ্মকাল। মিহিরবাবু খুব উত্তেজিত হয়ে ফোন করলেন আমায় : "দাদা, গতকাল পাপড়ির মামলার শুনানি ছিল। আপনাকে আর জানাইনি। প্রতিবারই আপনারা আসেন আর হয়রান হন। গতকালও শুনানি হ'ল না। ডাক্তার মলের উকিলরা এসে জজকে জানালেন যে তাঁরা আর একটা দিন চান। তারপর তাঁরা ওখানে ব'সেই, আমারই সামনে আমাদের উকিলকে বললেন — যান দাদা, সুমনকে দিয়ে আর-একটা গান লেখান।"

মিহিরবাবু রাগে, অপমানে, দুঃখে প্রায় কাঁদছিলেন।

* * *

সুদীপ্ত চট্টোপাধ্যায়কে যখন প্রথম দেখি, তিনি তখন শিশু। আমি তখন সবে চাকরিতে ঢুকেছি। সাল ১৯৭০-৭১। সুদীপ্তর বাবা অধ্যাপক শিশির চট্টোপাধ্যায় ছিলেন যাদবপুর বিশ্ববিদ্যালয়ে আমার শিক্ষক। আমার শ্রদ্ধা, ভালোবাসা আদায় ক'রে নিয়েছিলেন তিনি। শিশিরবাবু অকালে চ'লে গেলেন। তাঁর অন্ত্যেষ্টিক্রিয়ার সময়ে তাঁর শিশুপুত্র সুদীপ্তকে প্রথম দেখি। ১৯৯৩ সালে তরুণ সুদীপ্ত আমার সঙ্গে যোগাযোগ করেন আমেরিকা থেকে। মাঝের অতগুলো বছরে তাঁর সঙ্গে আমার কোনো সম্পর্ক ছিল না। তরুণ সুদীপ্ত নিজের পিতৃপরিচয় দিলেন এবং আমার কিছু গান ইংরিজিতে অনুবাদ করার অনুমতি চাইলেন। এরপর সুদীপ্ত তথ্যচিত্র তৈরির দিকে ঝোঁকেন এবং ঠিক করেন যে আমার ওপর একটি তথ্যচিত্র করবেন।

১৯৯৫ সালের গোড়ার দিকে শ্রী সুদীপ্ত চট্টোপাধ্যায় এলেন নিউ ইয়র্ক থেকে আমার ওপর তথ্যচিত্র তুলবেন ব'লে। বেশ কিছু কাজ ক'রে ফিরে গেলেন। আমার বিরুদ্ধে টেলিফোন-চক্রান্ত এবং নানান কাগজে চরম বিষোদ্‌গারের পর ক্রুদ্ধ হয়ে সুদীপ্ত আবার এলেন সে-বছরেই ক্যামেরা নিয়ে। এইসব ঘটনার পর তিনি ঠিক করলেন তথ্যচিত্রটি তিনি অন্যভাবে সাজাবেন। পরিস্থিতি সুদীপ্তকে বাধ্য করল আমার ব্যক্তিত্ব, আমার পরিবেশ এবং আমাদের অবস্থাটাকে একটি বিশেষ দৃষ্টিকোণ থেকে দেখতে।

আবার আমার সাক্ষাৎকার নিলেন তিনি। যে-কথাগুলি আমি বলতে চাইছিলাম অথচ কেউ শুনতে চাইছিল না, সেগুলি আমি তাঁর তথ্যচিত্রে বলতে পারলাম।

মিহিরবাবু ও তাঁর স্ত্রীর বক্তব্যও ধ'রে রাখলেন সুদীপ্ত। সাংবাদিক ও লেখিকা শ্রীমতি মৈত্রেয়ী চট্টোপাধ্যায়ও সাক্ষাৎকার দিলেন।

গানের কারিগর, গায়ক, সমাজকর্মী পিট সীগারকেও ধ'রে রেখেছেন সুদীপ্ত এই তথ্যচিত্রে। আমেরিকার এই বিরাট শিল্পী ছবিটির আবহসংগীত ক'রে দিয়েছেন। আমি ভাবতেও পারি না।

'Free to Sing' নামে সুদীপ্তর এই তথ্যচিত্র মার্কিন যুক্তরাষ্ট্র, অস্ট্রেলিয়া ও ইংল্যান্ডের কয়েকটি জায়গায় দেখানো হয়েছে।

(ডিসেম্বর, ২০০০-এর সংযোজন : সুদীপ্ত এখন আমেরিকার বস্টন শহরে অধ্যাপনা করেন, আর করেন নাট্যচর্চা)

* * *

কমপিউটার-মাধ্যমিক আধুনিকতম বিশ্ব-যোগাযোগ ব্যবস্থা 'ইন্টারনেট'-এও আমি স্থান পেয়ে গিয়েছি। সুদীপ্ত ও তাঁর আমেরিকান বন্ধুরাও এ-কাজটি ক'রে বসে আছেন।

'HTML Publishing on the Internet' বইটি দুই গ্রন্থকার কেনি চু ও ফ্রান্‌সিস চিন্ আমাকে পাঠিয়ে দিয়েছেন। তার নবম অধ্যায়টি হ'ল ঃ

Case study :

The Suman Chatterjee WWW Site

আমার বাড়িতে 'ইন্টারনেট'-যোগাযোগ বসানো নেই। কমপিউটারের কিছুই জানি না আমি। যাঁরা এসব জিনিস ঘাঁটাঘাঁটি করেন, কেনি ও ফ্রান্‌সিসের লেখা এবং 'ম্যাক্‌গ্রহিল্' প্রকাশিত এই বইটির নির্দেশ অনুসরণ করলে তাঁরা আমার ওপর তৈরি 'হোম পেজটি' পেয়ে যাবেন।

ব্যাপারটা আমি এখনও কোনো 'ইন্টারনেট' যুক্ত কমপিউটারে দেখিনি। বইটায় দেখছি আমার অনেকগুলো গানের ইংরিজি রূপান্তর। সুদীপ্তর কীর্তি। এগুলোই 'ইন্টারনেট'-এ দেখা যাবে :

"Many a window I've seen ablaze!
On many the likeness of her face,
On many the monsoon's untimely rage."

"আগুন দেখেছি আমি কত জানালায়!"

* * *

টুকাইকে দেখা যেত ওর ঘরের জানালা দিয়ে। ওর ঘরটা ছিল রাস্তার ওপরেই। ওদের বাড়িটা আমার বাবা-মার বাড়ির উল্টো দিকে।

টুকাই আমার চেয়ে বছর দশেকের ছোট ছিল। আমি যখন প্রথম চাকরিতে ঢুকি, ও তখন স্কুলে যায়। তারও আগে ওকে দেখতাম, হাতে

বানানো তীর-ধনুক নিয়ে আমাদের বাড়ির পেছন দিকের বাঁশঝাড়ে বীরদর্পে ঘুরে বেড়াচ্ছে।

আমার সামনে বড় হয়ে উঠল টুকাই। আমি ওর সামনে বয়স্ক হয়ে উঠলাম। আমাদের বন্ধুত্ব হ'ল।

অমন তীক্ষ্ণ মেধা, অমন উদার মন কমই দেখেছি। টুকাই জন্মেছিল বোধহয় 'আউটসাইডার' হয়ে। চাকরি করল। কিন্তু কোথাও মন টিকল না। বাড়িতেও সমানে অবনিবনা। "পৃথিবী যে নিয়মে চলছে, সে ঠিক সে-নিয়মে চলে না। তাকে সহজে বোঝা যায় না। তার ভাবনা অন্যরকম।"

আমার সঙ্গে যত রাজ্যের গল্প। গান। আমার অনেক গান টুকাই-ই প্রথম শুনেছে। তখন আমায় চিনত ক'জন?

রাতে আমরা দু'জন হাঁটতে বেরোতাম। বেড়াতাম। দাদুর দোকানে সিগারেট কিনে খালের ধারে খোকনের দোকানে বেঞ্চিতে ব'সে চা খেতাম।

নড়বড়ে, ভাঙাচোরা বেঞ্চি। ভাঙাভাঙা পথ। সুনীলের চোক্‌লা-ওঠা সাইকেল রিকশা। বিহারীর পানের দোকানে পেট্রোম্যাক্‌সের ভুতুড়ে আলো। খোকনের আধময়লা চায়ের গেলাস। একটা কোণ ফাটা। সব মিলিয়ে টুকাই-এরই ছবি। আমাদের দু'জনের ছবি —

চেনা ভাঙা পথঘাট। চেনা বাড়ি চেনা মাঠ।.... চেনা মোড়ে চেনা দঙ্গল। চেনা ছেলেদের জোট....। চেনা চেনা চায়ের গেলাস....। চেনা বাস চেনা রুট চেনা রুটি বিস্কুট.....

* * *

"কত জানলার কাছে একলা মানুষ
একলা পৃথিবী তার যেন মহাকাল
কত জানলায় আসে একার সকাল...."

— টুকাই জানালার কাছে বসে আছে। আধশোয়া হয়ে আছে। সিগারেট টানছে। আমার চোখদুটোকে টানছে।

লেওনার্ড কোহেনের গান ভেসে আসছে মাঝেমাঝে। টুকাই শুনছে আমিও শুনছি বাবা-মার বাড়ির দোতলার একটা ঘর থেকে। এই ঘরে ব'সে কত গান বেঁধেছি।

কোহেন আমাদের দু'জনেরই প্রিয়। আর প্রিয় বুদ্ধ। তথাগত।

পাথর, তুমি কেঁদো না,
তথাগত, তিনি স্থানু
তাঁর ধ্যানস্থ রক্তে
চরাচর নতজানু....

* * *

টুকাই আত্মহত্যা করল ১৯৯৩ সালে আগস্ট মাসে। বারাসাতের আমডাঙা নামে একটা জায়গায়।

বাড়ি ছেড়ে বেরিয়ে পড়েছিল ছেলেটা। দু'দিন নিখোঁজ ছিল। তারপর।

টুকাই কোনোদিন মেলাতে পারল না নিজেকে জগৎসংসারের সঙ্গে। টুকাই যখন হারিয়ে গেল, বন্ধু আয়ান রশিদ খানের কাছে গিয়েছিলাম। রশিদ তখন ছিলেন বেঙ্গল পুলিশের আই. জি. (ক্রাইম)।

মর্গ থেকে টুকাইকে নিয়ে আসা অত সহজে হ'ত না আয়ান রশিদ সাহায্য না করলে।

রশিদ, আমি সারাজীবন কৃতজ্ঞ থাকলাম তোমার কাছে শুধু এই জন্য।

*　　*　　*

প্রতিদিন তোর কথা ভাবি, টুকাই।

*　　*　　*

ছেলের মৃত্যুসংবাদ পৌঁছে দিতে হ'ল বাবার কাছে।

আরও কত বছর বাঁচতে হবে রে টুকাই এইসব স্মৃতি নিয়ে? আরও কতবার মঞ্চে উঠে গিটার নিয়ে গাইতে গাইতে হঠাৎ মনে পড়বে তুই নেই?

আমার বয়স বাড়ছে, টুকাই। আর ভাল্লাগেনা রে, মাঝেমাঝে। কিচ্ছু ভাল্লাগে না।

"The woods are lovely, dark and deep
But I have promises to keep
And miles to go before I sleep
And miles to go before I sleep".

— Robert Forst

*　　*　　*

১৯৯৪ সাল। কোনো এক সন্ধে। অঞ্জন দত্ত গান গাইবেন জ্ঞান মঞ্চে। শুনতে গেছি। গিটার হাতে অঞ্জন গাইছেন। রুক্ষ মুখে ওপর থেকে একফালি আলো এসে পড়েছে। ওর ছেলে নীল আলো-আঁধারিতে একটা টুলের ওপর ব'সে ট্যাম্বুরিন বাজাচ্ছে।

"পাড়ার নেড়ি বাচ্চাটাকে মুখে ক'রে হাঁটতে শেখায়..."

*　　*　　*

অনে—ক দিন পর আমি কারুর গান শুনে কাঁদছিলাম।

"And you want to travel with him
And you want to travel blind

And you know you can trust him
For he touched your perfect body
with his mind"

— Leonard Cohen

১৯৭৩ সাল। গঙ্গার ঘাটে মশলামুড়ি খাচ্ছি। ছোট্ট একটা ছেলে এল। বয়স পাঁচ-ছ বছরের বেশি নয়। খালি গা। নোংরা প্যান্ট। ময়লা শরীর। কাছে এসে মুখ তুলে বলল : বাবু, ঠোঙাটা ফেলো না, ওটা আমি চাটব।

* * *

১৯৭২ সাল। নরেন্দ্রপুরে ইউনাইটেড ব্যাংক অফ ইন্ডিয়ায় কেরাণীর চাকরি করছি। বছর বারো-তেরোর একটি ছেলে, গায়ে-আধময়লা-জামা-প্যান্ট-খালি-পা, অফিসে ঢুকে বলল —"তোমরা আমায় টাকা ধার দেবে? আমি ব্যবসা করব।"

কিসের ব্যবসা?

"লজেন্সের। একটা কাঁচের বয়াম কিনব। লজেন্স কিনব। গড়িয়ার মোড়ে বিক্রি করব। কুড়ি টাকা হলেই হবে।"

আমরা, তরুণ কেরাণীরা চাঁদা তুলে তাকে টাকা দিলাম।

মাসখানেক পর রথতলা স্টপেজে দাঁড়িয়ে আছি, দেখি সেই ছেলেটা। আমায় দেখে ছুটতে ছুটতে আসছে। সেই একই আধময়লা জামাপ্যান্ট, খালি-পা। হাতে একটা কাঁচের বয়ামে সবুজ সবুজ লেবেঞ্চুস। এক গাল হেসে হাঁফাতে হাঁফাতে বলল —"দেখেছ, তোমাদের দেওয়া টাকা নষ্ট করিনি, ব্যবসা করছি।" কী গর্ব ছোট্ট ছেলেটার মুখে চোখে।

ঐ ছেলেটা আমায় বেঁচে থাকার সাহস দেয়।

* * *

১৯৮৫ সাল। নিকারাগুয়ার বিপ্লবের ওপর বই লিখতে গিয়েছি সেই দেশে। মানাগুয়ার পথে পথে ঘুরে বেড়াচ্ছি। একটি কিশোর রাস্তায় খেলছে ঠিক আমাদের দেশের সাধারণ ছেলেদের মতো। তাকে একথা ওকথা জিজ্ঞেস করতে করতে হঠাৎ দুম ক'রে প্রশ্ন করলাম : তোমার দেশে একটা বিপ্লব হয়েছে। তুমি জানো?

— হ্যাঁ।

বিপ্লব কী? — আমার প্রশ্ন কিশোরটি ভাবতে লাগল, একটু অন্যমনস্ক হয়ে, রাস্তায় পায়ের আঙুল ঘসতে ঘসতে। তারপর হঠাৎ মুখ তুলে বলল :

"সোই লা রেভোলুসিয়ন।"—

আমিই বিপ্লব।

গড়িয়ার লেবেঞ্চুস-ছেলেটার সঙ্গে যদি মানাণ্ডায়ার ঐ ছেলেটার দেখা হত? নিশ্চয়ই খুব বন্ধু হত দু'জনে।

*　　*　　*

আমার বন্ধু, আমার বাবা মারা যাচ্ছেন। ১৯৯৪ সালের তিরিশে অক্টোবর। আগের রাতটা গড়িয়ায় ছিলাম। বাবা অচৈতন্য। অক্সিজেন দেওয়া হচ্ছে।

তিরিশে অক্টোবর একটা একক অনুষ্ঠান কল্যাণীতে। আমার প্রচণ্ড চিন্তা। কী হবে। যদি না যাই, না গাই, গোলমাল হতে পারে। ছোট, একটু গণ্ডগোল হলেই কোনো-কোনো মহান সংবাদপত্রে খবর বেরোবে — 'সুমনের অনুষ্ঠানে ভাঙচুর।' উদ্যোক্তাদের হয়তো হেনস্তা করবে কেউ। ভয় করে। ১৯৯১ সাল থেকেই যে ভয়ে ভয়ে বেঁচে আমি এই শহরে। কত রকমের শত্রু যে বানিয়ে ফেলেছি।

তিরিশে একটু বেলায় ভবানীপুরের বাসায় ফিরলাম। ভেবে নিয়েছি, বাবা যদি একটু থেকে যান, অনুষ্ঠানটা ক'রে আসতে পারব। দিন দুই রেয়াজ হয়নি, তাই খাওয়ার আগে রেয়াজে বসেছি। বাবার কথা ভাবছি। রেয়াজ করতে করতে যথারীতি গান লিখছি —

তুমি তো চললে
সক্কলে যায়
'থাকতে এসেছি' ভাবতে ভাবতে
সবাই পালায়।

খেতে বসেছি। ফোন এল। মারিয়া ধরলেন। চাপা স্বরে কথা বললেন। ফোন শেষ। ওঁর মুখ দেখে আমি উঠে গেলাম। মারিয়া শান্ত গলায় বাংলায় বললেন — "সব শেষ।"

*　　*　　*

সুব্রত আর কৌশিক থাকবে বাবাকে শ্মশানে নিয়ে যাওয়ার সময়ে সাহায্য করার জন্য।

আমাকে মায়ের অনুমতি নিতে হবে।

বাবা ঘুমিয়ে আছেন। পরম শান্তিতে।

মার ঘরে ঢুকতেই মা একটু কেঁদে উঠলেন। আমি ব'কে থামিয়ে দিলাম। — কাঁদছ কেন, বাবার সঙ্গে এবার কাটুম আর টুকাই-এর দেখা হবে। (কাটুম ছিল আমাদের সবার বন্ধু, আমাদের কুকুর।)

তাছাড়া, একদিন তো তোমার সঙ্গেও বাবার দেখা হবে আবার, মা। তারপর আমাদের সঙ্গে। ক'দিনের মামলা? টুকাই এখন বাবার সঙ্গে আড্ডা দেবার তোড়জোড় করছে। কাঁদবে না একদম। এসো বরং আমরা বাবাকে বলি —

"হ্যাপি জার্নি!"

মা চোখে জল নিয়ে ফিক ক'রে হেসে ফেললেন। আমার মা রিউম্যাটয়েড আর্থরাইটিস-এ শয্যাশায়ী ১৯৯১ সাল থেকে। বাবার শেষ মুহূর্তটা মাকে দেখতে হয়নি, কারণ বাবাকে পাশের ঘরে রাখা হয়েছিল।

বিকেল হয়ে আসছে। আমার মধ্যে যে কী হচ্ছে তা আমিই জানি। কারণ সন্ধে ছ'টায় কল্যাণীতে আমার একক অনুষ্ঠান। আর বাবার একক যাত্রা অন্য দিকে।

দুম করে ব'লেই ফেললাম মাকে। মা আগে থেকেই জানতেন। আমি অনুমতি চাইতেই মা সহজ কণ্ঠে ব'লে দিলেন —

"যা, গান গেয়ে আয়। তোর বাবাকে জিজ্ঞেস করলেও এটাই বলতেন। কিছু ভাবিস না, তুই তোর কাজ ক'রে আয়।"

আমি বাবার কাছে বিদায় নিলাম।

* * *

একটি মুহূর্তও দেরি হয়নি আমার কল্যাণীতে অনুষ্ঠান শুরু করতে। কৃতিত্বটা আমাদের চালক আশিসের।

আড়াই ঘণ্টা একটানা গান গাইলাম। কোনো বিরতি নিইনি। আমাকে শ্মশানে পৌঁছাতেই হবে।

বাবার সম্মানে আমি সেই রেকর্ড করা গান গাইলাম। আমার অনুষ্ঠানে — 'ভুলে যেও মোর গান।'

কিভাবে যে আশিস এত অল্প সময়ে আমাকে কল্যাণী থেকে কলকাতার ক্যাওড়াতলা শ্মশানে পৌঁছে দিলেন, তিনিই জানেন।

* * *

বাবা তাঁর চোখদু'টি দান ক'রে গিয়েছিলেন। বাবাকে শেষের ক'দিন যিনি দেখেছিলেন সেই ডাক্তার সরকারকে প্রচুর ঝামেলা পোহাতে হয়। সংশ্লিষ্ট বিভাগ থেকে লোক আনার জন্য প্রথমে ফোন করায় ও-প্রান্ত থেকে কে একজন বলছিলেন — "এখানে কেউ নেই, কাউকে পাওয়া যাচ্ছে না।"

ডাক্তার সরকার প্রচুর চেঁচামেচি করেন নাছোড়বান্দার মতো, শেষবেশ অনেক দেরিতে লোক আসে বাবার চোখ নিতে। ডাক্তার সরকারের স্ত্রী কয়েক ঘণ্টা ব'সে ব'সে কী একটা 'লোশন' দিয়েছিলেন বাবার চোখে, নয়তো চোখদুটো তাজা থাকত না।

"এমন দেশটি কোথাও খুঁজে
পাবে না কো তুমি...."

— দ্বিজেন্দ্রলাল রায়।

*　　*　　*

এক ভদ্রলোক কলকাতার অনেক দেওয়ালে 'চক্ষুদানের' আহ্বান লিখিয়েছিলেন। কয়েকটা পড়েছি। তলায় বড় বড় ক'রে ভদ্রলোকের নাম লেখা। কতরকমের মানুষ আছেন।

*　　*　　*

১৯৯৪ সালের নভেম্বর-ডিসেম্বর মাস নাগাদ একজন 'মানুষ' দেখা করতে এসেছিলেন আমার সঙ্গে। বেশ ভালো জামাকাপড় পরা। মধ্যবয়স্ক। হাতে দামী চামড়ার ব্যাগ।

ভদ্রলোক জানতে চাইলেন, অনীতা দেওয়ানকে নিয়ে যে গান আমার আছে, সেটি আমি রেকর্ড করছি না কেন? গ্রামোফোন কম্পানির আপত্তির কারণে কি? আমি বললাম — আজ্ঞে না। ও গানটা গাইতে আমার এত কষ্ট হয় যে বেশি গাই না। রেকর্ড করার কথাও ভাবিনি। তবে পরে হয়তো কখনও করব।

ভদ্রলোক একাধিকবার জানালেন, টাকাপয়সার কারণে যদি রেকর্ডিং সম্ভব না হয়ে থাকে তো 'তাঁরা' টাকাপয়সা দেবেন।

কিঞ্চিত বিরক্ত হয়ে তাঁকে জানিয়ে দিলাম যে গ্রামোফোন কম্পানীর শিল্পী হিসেবে আমার রেকর্ডিং খরচ লাগে না।

একটু অবাকই হচ্ছিলাম ভদ্রলোকের কথাবার্তা শুনে, হাবভাব দেখে।

এবারে তিনি বললেন — শুনলাম আপনি বাড়ি পাল্টাচ্ছেন। কলকাতার কোন অঞ্চলে বাড়ি চান, ক'টা ঘর হ'লে ভালো হয়, বাগান দরকার কিনা — এসব আমায় যদি বলেন তো আমরা আপনাকে বাড়ির বন্দোবস্ত ক'রে দেব।

এই 'আমরা'টি কারা?

তিনি আমায় অবশ্যই বলেছিলেন। নিজের কানকেও বিশ্বাস করতে পারিনি আমি। তিনি আবার বলেছিলেন। কেউই বিশ্বাস করবে না। একটা আস্ত বাড়ি দিয়ে কাউকে কিনতে আসে মানুষ। যাকে নিতে চাওয়া হচ্ছে তাকে গম্ভীরমুখে এই প্রস্তাব দেওয়া হয়।

অথবা ঐ প্রস্তাবটাই একটা ফাঁদ। সুবেশ ভদ্রলোকের মূল্যবান চামড়ার ব্যাগটিতে কি টেপ রেকর্ডার লাগানো ছিল? যদি তাই থেকে থাকে তো যাঁরা ঐ 'মানুষটি'কে পাঠিয়েছিলেন তাঁরা নিশ্চই আমার কথাগুলো রেকর্ডিং থেকে শুনে নিয়েছেন। আর নয়তো 'মানুষটি' নিজেই জানিয়ে দিয়েছেন আমার কথাগুলো যথাস্থানে।

*　　*　　*

ভয় করে মাঝে মাঝে। যারা এতদূর যেতে পারে তারা আরও দূর যাবে।

*　　*　　*

অনীতা দেওয়ান 'উন্মত্ত জনতার' হাতে নির্যাতিতা ও খুন হন ১৯৯০ সালে। খুন হন গাড়ির চালকও।

বানতলা।

নামটা এখনও অসম্ভব কষ্ট দেয়। অক্ষম ক্রোধ, ঘৃণা, আত্মধিক্কার ও অপার যন্ত্রণা থেকে 'অনীতা দেওয়ান' গানটি তৈরি করেছিলাম। ১৯৯০ সালেই।

১৯৯১ সালের জানুয়ারি মাসে শ্রী শুভেন্দু মাইতির মধ্যস্থতাতেই বোধহয় গণতান্ত্রিক লেখক শিল্পী সংঘের কলকাতা দপ্তরে আমার গান। ঘরটা বড় নয় বিশেষ। অনেকে এসেছেন। তাঁদের কাউকেই আমি চিনি না। আমার সঙ্গে গেছেন মারিয়া, ভার্জিনিয়া, দুই বন্ধু শ্রী জগন্নাথ চট্টোপাধ্যায় ও শ্রী অরুণ গঙ্গোপাধ্যায়।

শুভেন্দুদা যাঁদের সঙ্গে আলাপ করিয়ে দিলেন তাঁদের মধ্যে ছিলেন ইন্দ্রনাথ বন্দ্যোপাধ্যায়। ইন্দ্রনাথবাবু আবার আলাপ করিয়ে দিলেন শ্রী অজিত পাণ্ডের সঙ্গে। এঁদের আগে কখনও দেখিনি।

অজিতবাবুর একটা কাজ ছিল, তাই তিনি কয়েকটি গান শুনে, নিজের সম্পর্কে দু'এক কথা ব'লে চলে গেলেন।

আমি একটা চেয়ারে ব'সে গিটার নিয়ে গান গাইছি। মাইক্রোফোন নেই। শ্রোতারা মাটিতে ব'সে।

গানের ফাঁকে কথা চলছে। শ্রোতাদের মধ্যে কেউ কেউ নানান মন্তব্য করছেন। বিশেষ ক'রে দু'একজন বয়স্ক ভদ্রলোক। একজন বয়স্ক ভদ্রলোক বললেন — গান গাইতে গেলে জনতার সঙ্গে মিশে যেতে হবে। — এঁরা কেউই আমার বিন্দুবিসর্গও জানেন না। জানেন না আমার অতীত। আমার হয়ে ওঠা।

'দশরথ গেলেন মৃগয়ায়' গানটি শুনে সেই একই প্রবীণ ভদ্রলোক ব'লে উঠলেন — এই গানটা আরও আখর দিয়ে গাওয়া দরকার।

আমি সবিনয়ে জানালাম — আজ্ঞে আমি কীর্তন শিখিনি।

এ-গান সে-গান এ-কথা ও-কথার ফাঁকে আমার ছোট্ট বুড়িমা (ভার্জিনিয়া) ক্লান্ত হয়ে ঘুমিয়ে পড়ল। ছ'বছরের মেয়েটা মায়ের কোলে শুয়ে দিব্যি ঘুমোচ্ছে।

দু'একজন ভদ্রলোককে আমার বেশ ভালো লাগছে। এঁরা বেশি কথা বলছেন না। চুপচাপ গান শুনছেন। পরে আলাপ হয়েছে। শ্রী অনির্বাণ দত্ত এবং শ্রী অরিন্দম চট্টোপাধ্যায়।

ঘরোয়া অনুষ্ঠান শেষ হ'তে চলল প্রায়। আমি সকলকে বললাম — সবশেষে আমি একটা বিশেষ গান শোনাতে চাই।

নাটকীয়ভাবে ঠিক তখনই বিদ্যুৎ চ'লে গেল। খান দুই মোমবাতি জ্বালানো হ'ল। অদ্ভুত আলো-আঁধারি। ঘরভর্তি ছায়াছায়ামুখ। সিগারেটের ধোঁয়া। এবারে আমি মাটিতে ব'সে গিটার নিয়ে গাইছি আমার শেষ গান — 'অনীতা দেওয়ান, ক্ষমা ক'রো।' — চোখ বুজে গাইছি।

গান যখন শেষ হ'ল, দেখলাম জনা চারেক বাদে সবাই উঠে গেছেন। গান চলাকালেই উঠে গেছেন তাঁরা। পাশের একটা ঘরে চাপা গুঞ্জন।

ইন্দ্রনাথবাবু আমার মুখোমুখি বসে। মাঝখানে একটা মোমবাতি। ইন্দ্রনাথবাবুর পাশে তাঁর সিগারেটের প্যাকেট — ফিলটার উইল্‌স্‌। আমার পাশেও একই ব্র্যান্ড।

গানের শেষে পরিবেশ থমথমে। কেউ টুঁ শব্দটি করছে না। ইন্দ্রনাথবাবু আমার দিকে একটু ঝুঁকে কঠোরভাবে প্রশ্ন করলেন — "ক্ষমা চেয়ে অনুষ্ঠানটি শেষ করলেন কেন?"

আমি ঠিক একই ভঙ্গিতে তাঁর দিকে একটু ঝুঁকে বললাম —

কেন জানেন? কেননা, আমার ইচ্ছে এই গানটা একদিন রেকর্ড হোক, তার লক্ষ লক্ষ কপি বিক্রি হোক। আপনিও ফিলটার উইল্‌স্‌ খান, আমিও। আমিও চাই আরও ভালো ব্র্যাণ্ডের সিগারেট খেতে; আপনিও হয়তো তাই-ই চান। এই গানটা প্রচুর বিক্রি হলে আমি সেই টাকায় বন্ধুদের নিয়ে চাইনিজ খেতে যাব।

'অনীতা দেওয়ান, ক্ষমা ক'রো,
বড় বেকুবের মতো গান গাইছি
আর কিছু পারি না ব'লে....'

* * *

১৯৯০ সাল। ফেব্রুয়ারি মাস।

গড়িয়ায় শ্রী রাজু বল নামে একটি ছেলেকে চিনতাম। রাজু এসে বললেন, কলকাতা উৎসব হচ্ছে, সেখানে তিনি গাইবেন, তাঁকে কয়েকটা গান শিখিয়ে দিতে। দিলাম।

একদিন রাজু শ্রী ইন্দ্রনীল গুপ্ত নামে এক ভদ্রলোককে ধ'রে আনলেন। তিনি গান শুনতে চাইলেন। 'তিন শতকের শহর' গানটা তখন সদ্য বেঁধেছি। সেটাই শোনালাম। ইন্দ্রনীল, ডাকনাম মন্টা, মহা খুশি। তিনি বললেন, এ গান অন্যদেরও শোনা দরকার। কলকাতা উৎসবে আমাকে গাইতে হবে।

সতের বছর কোনো অনুষ্ঠানে গাইনি। বললাম — আমায় ছেড়ে দিন। ভদ্রলোক ছেড়ে দেওয়ার পাত্র নন।

ফেব্রুয়ারি মাসের কোনো একদিন সল্টলেক স্টেডিয়ামের লাগোয়া মাঠে গাইতে গেলাম। রাজু গেলেন সঙ্গে। মারিয়া তখন কলকাতায়। তিনিও গেলেন। আর গেলেন বন্ধু টুকু ও সুজয়। একটা ট্যাক্সিতে এতগুলো লোক, গিটার, একটা ছোট কিবোর্ড, এম্প্লিফায়ার ইত্যাদি।

অনেক শ্রোতা। ঘোষক ছিলেন পুরনো বন্ধু শ্রী তরুণ চক্রবর্তী। তিনি তো অবাক আমাকে দেখে।

আমার সে কী ভয়! বছর সতের জনসমক্ষে বা মঞ্চে গান গাইনি। তেমন প্রস্তুতি নেই। স্বরচিত গান গাইব। লোকে জীবনে শোনেনি এসব গান, এ-ধরনের গান। ঘাড় ধ'রে নামিয়ে দেবে যে আমাকে।

কিন্তু পালানোর পথও তো নেই। উঠতেই হ'ল মঞ্চে। মন্টা বোধহয় গা ঢাকা দিয়েছেন, দেখতে পাচ্ছি না কেন?

কয়েক হাজার মানুষের সামনে, অনেক বছর পর মাঝবয়সে আবার মঞ্চে উঠে কেমন যে লাগছিল তা আমিই জানি।

সামান্য একটু ভূমিকা। গিটার বাজিয়ে ধরলাম 'তিন শতকের শহর।' এতো নার্ভাস যে আঙুল ঠিকঠাক পড়ছে না তারগুলোয়। নেহাতই ঠেকা দিচ্ছি। মরিয়া হয়ে গাইছি। প্রতি মুহূর্তে অপেক্ষা করছি — এই বুঝি লোকে চ্যাঁচাতে শুরু করল, এই বুঝি জুতো ছুঁড়ল কেউ, এই বুঝি....।

ওমা, তা তো নয়! আমি দেখছি লোকে চুপ ক'রে ব'সে শুনছে। শান্ত। কেউ তেমন নড়ছে না পর্যন্ত। অতজন।

গান শেষ হ'ল। এক মুহূর্ত নিথর। ঐ একটি মুহূর্ত আমার কাছে এক হাজার বছর। তারপরেই তুমুল হাততালি।

অলৌকিক ঘটনা। অবিশ্বাস্য।

এবার আমি কিবোর্ডে। একটাই কিবোর্ড। তেমন ভালো জাতের নয়। খুব একটা ভালো আওয়াজ হচ্ছে না। আমি গাইছি 'গড়িয়াহাটার মোড়।'

শ্রোতাদের দিকে তাকিয়েই গাইছি। দেখতে পাচ্ছি, আরও অনেক লোক জড়ো হয়েছে। পুলিশকর্মীরাও দেখছি দল বেঁধে গান শুনছেন।

তিনটি গান গাইতে হবে। তার বেশি নয়। দ্বিতীয় গানের পর আবার ব্যাপক হর্ষধ্বনি। শেষ গান 'তোমাকে চাই'।

আরও মানুষ এসে পড়েছেন। বাইরে যথেষ্ট বৈদ্যুতিক আলো। তাঁদের মুখগুলি মোটামুটি স্পষ্ট দেখতে পাচ্ছি। সকলেই কেমন যেন হতবাক। মন্ত্রমুগ্ধ।

গান শেষ হ'ল। শুরু হ'ল প্রচণ্ড করতালি, চিৎকার। 'আরও চাই'।

আমি নেমে গেলাম। তরুণ ঘোষণা করতে উঠলেন। শ্রোতারা তাঁকে ব'কে দিলেন। তরুণ বেকায়দায়। অনুষ্ঠান চালানো দায়। আমি বিব্রত। দর্শক-শ্রোতা উত্তেজিত।

এক ভদ্রলোক হাজির হঠাৎ। চট্‌পটে। হাতে একটা 'ওয়াকি-টকি' যন্ত্র।

মঞ্চ ফাঁকা। শ্রোতারা এত উত্তেজিত যে পরের শিল্পী উঠতে পারছেন না মঞ্চে। "সুমনবাবু, সামাল দিতে হবে। মঞ্চে উঠুন আমার সঙ্গে।"

উঠলাম। আবার তুমুল হর্ষধ্বনি। কয়েক হাজার শ্রোতার সামনে করজোড়ে দাঁড়িয়ে বললাম, কখনও স্বপ্নেও ভাবিনি যে এতজন মানুষ এভাবে আমার স্বরচিত গান শুনবেন, আমায় উৎসাহ দেবেন। আমি আবার গাইব, তবে আজ নয়। আরও শিল্পী আছেন। তাঁদের গান শোনা দরকার। সকলে যেন আমায় মার্জনা করেন।

সেই ভদ্রলোক দর্শক-শ্রোতাদের কথা দিলেন —"একদিন সুমনবাবু সারা সন্ধে আপনাদের গান শোনাবেন।"

কয়েকজন শ্রোতা চেঁচিয়ে উঠলেন —

"কবে?"

"যথাসময়ে জানানো হবে।" আমরা নেমে গেলাম। অনুষ্ঠান চলল।

আমাকে ঘিরে ভিড় জ'মে গেল। স্বেচ্ছাসেবীরা আমাদের ঘিরে নিয়ে পৌঁছে দিলেন সল্টলেক স্টেডিয়ামের একটি ঘরে। সঙ্গে নিয়ে যাওয়া হ'ল প্রবীণ শিল্পী শ্রী ভি. বালসারাকে।

ঘরে ঢুকে সেই চটপটে ভদ্রলোকটি নিজের নাম বললেন — শ্রী নেপালদেব ভট্টাচার্য। দারুণ উত্তেজিত তিনি। বারবার বলতে লাগলেন —"বড্ড দেরি হয়ে গিয়েছে। আপনারা দু'জনে মিলে কিছু একটা করুন।"

'আপনারা দু'জনে' মানে শ্রী ভি. বালসারা আর আমি!

নেপালবাবুর চোখেমুখে, কথায়, হাবভাবে প্রবল উত্তেজনা, আত্মবিশ্বাস আর আন্তরিকতা ফুটে উঠছিল। মনে হচ্ছিল, তিনি যা বলছেন, সৎ উপলব্ধি থেকেই বলছেন।

একদম নামহীন, খ্যাতিহীন একজন সাধারণ নাগরিকের বাঁধা-গাওয়া তিনটি মাত্র গান শুনে কয়েক হাজার প্রস্তুতিহীন শ্রোতার যে কী অবস্থা হ'ল, নেপালবাবু তা স্বচক্ষে দেখেছিলেন।

বারবার তিনি বলতে লাগলেন, যত তাড়াতাড়ি সম্ভব আমাদের আবার বসা দরকার।

নেপাল, আপনার মনে পড়ে?

তারপর দু'বছর শ্রী নেপালদেব ভট্টাচার্যের সঙ্গে আমার দেখা হয়নি।

* * *

১৯৯০ সালের ফেব্রুয়ারি মাসে সল্টলেক স্টেডিয়ামে যা ঘটল, আমার জীবনে তা সবচেয়ে গুরুত্বময় ঘটনাগুলির একটি। আমি অকাট্য প্রমাণ পেয়ে গেলাম — আমার গান কিছু মানুষকে অন্তত স্পর্শ করতে পারছে।

তখন আমার কাজকর্ম, সৃষ্টি, পরিকল্পনা সম্পর্কে কেউ কিছু জানতেন না। কয়েকজন বন্ধুবান্ধব ছাড়া আমাকে চিনতেনও না কেউ।

শ্রোতাদের কষ্টিপাথরে নিজেকে যাচাই করার এই সুযোগটি যিনি দিয়েছিলেন, সেই শ্রী ইন্দ্রনীল গুপ্ত (মন্টার) কাছে আমি কৃতজ্ঞ রইলাম।

হঠাৎই তিনি এসে পড়েছিলেন আমাদের গড়িয়ার বাড়িতে। হঠাৎই তাঁকে শুনিয়েছিলাম নিজের-বাঁধা একটি গান: তিন শতকের শহর। হঠাৎই তিনি আমায় জোর ক'রে ধ'রে নিয়ে গিয়েছিলেন কলকাতা উৎসবে। শুনেছি, আমার মতো একজন বিলকুল অজ্ঞাতকুলশীল ব্যক্তিকে অনুষ্ঠানের অন্তর্ভুক্ত করতে তাঁকে বেগ পেতে হয়েছিল। সেটাই তো স্বাভাবিক।

শ্রোতাদের সামনে অমন হাতে-গরম সাফল্যের পরেও শ্রী গুপ্ত কিন্তু কখনও আমাকে 'আবিষ্কার' করার কৃতিত্ব দাবি করেননি। কখনও তিনি আমাকে 'ব্যবহার' করার চেষ্টা করেননি। কোনোদিন কিছু দাবি করেননি আমার কাছে।

তাঁকে নমস্কার।

* * *

"নমস্কার, আমার নাম শুভেন্দু মাইতি।" ১৯৯০ সালের পঁচিশে ডিসেম্বর সকালবেলা ভবানীপুরের বাসায় কড়া নেড়ে নিজের পরিচয় দিলেন খদ্দরের পাঞ্জাবি আর ধুতি পরা এক ভদ্রলোক। একমুখ মানবিক হাসি।

বাসায় আমি একা। আমি কফি বানাচ্ছি। ভদ্রলোকটি আমার পাশে এসে দাঁড়িয়েছেন। বলছেন — "আমার সম্পর্কে ভালো ক'রে খোঁজ নিন।" আত্মপ্রত্যয়। সততা।

কোথায় খোঁজ নেব? আমি যে বহুবছর বিদেশে ছিলাম। ক'জনকে চিনি এখানে? আর, বেশি খোঁজ নিয়েই বা কী হবে?

পাশের বাড়ির দুই বাচ্চা টুইংক্‌ল্ আর টম ঢুকে পড়েছে দরজা খোলা পেয়ে। শুভেন্দুবাবু দু'টি বাচ্চাকে কোলে টেনে নিয়ে মেঝেতে ব'সে পড়লেন। বললেন — গান শোনান।

আমি তাঁকে 'প্রথম সবকিছু' শোনাচ্ছি। সদ্য বেঁধেছি। শুভেন্দুবাবু কাঁদছেন। ধুতির কোঁচা দিয়ে চোখ মুছছেন। শুভেন্দুদা, নব্বই সালের বড়দিনের সকালে তোমার এই ছবিটাই স্থিরচিত্র হয়ে থেকে গেল সারাজীবনের জন্য।

* * *

কত জায়গায় যে শুভেন্দুদা আমায় নিয়ে গেছেন। কতজনের কাছে আমার কথা ব'লে বেড়িয়েছেন। গ্রামোফোন কম্পানি অফ ইন্ডিয়ার শ্রী সোমনাথ চট্টোপাধ্যায়ের কাছেও। সোমনাথ বলেছেন শ্রী রবি কিচলুকে।

* * *

ঘরে ব'সে সাধারণ টেপ-রেকর্ডারে তোলা আমার কয়েকটা গান ক্যাসেটে ভরে সোমনাথের কাছে পৌঁছে দিয়ে এসেছিলাম শুভেন্দুদার কথাতেই।

সোমনাথ তা শোনান রবিবাবুকে। রবিবাবু আমায় ডেকে পাঠালেন।

* * *

"দাদা, একবার রিপন স্ট্রিটে এসো।" সোমনাথের ফোন। গিয়ে দেখি রবিবাবুদের বিভাগ থম্‌থমে। সোমনাথ জানালেন, কম্পানির প্রেসিডেন্টকে ক্যাসেটটি শোনানো হয়েছিল। তাঁর প্রতিক্রিয়া —

'এই ব্যক্তির সংগীত সম্পর্কে কোনো আইডিয়াই নেই। এর লিরিক নেহাৎই মামুলি। 'বাথরুম সিংগারের' মতো গায়।"

কথাগুলি আমায় জানানো হ'ল। রবিবাবু বললেন, তিনি পদত্যাগ করবেন। সোমনাথ বললেন — তিনিও।

পরে অবশ্য, রবিবাবুর অগ্নিশর্মা মূর্তি দেখে ব্যাপারটা ধামাচাপা দেওয়া হয়। শ্রী রবি কিচলুরই জয় হ'ল।

* * *

১৯৯৩ সালের মার্চ মাসে 'তোমাকে চাই'-এর জন্য 'গোল্ড ডিস্ক' এবং 'বসে আঁকো'র উদ্বোধন-অনুষ্ঠানে ঐ প্রেসিডেন্টই আমাকে পকেট থেকে 'পার্ট রয়্যালটি পেমেন্ট'-এর চেক বের ক'রে দিয়েছিলেন।

* * *

"Give me one good reason why
you want to record me."
"I'll be doing a service to Indian music."

শ্রী রচি কিচলু না থাকলে 'তোমাকে চাই' রেকর্ড হ'ত না। ক্যাসেট হিসেবে বেরোত না। তিনি কিন্তু 'বাঙালি' ছিলেন না। নতুন ধারার আধুনিক বাংলা গান ঋণী থেকে গেল একজন 'অবাঙালির' কাছে।

* * *

নতুন ধারার গান। ১৯৮১ সালে মার্কিন যুক্তরাষ্ট্রে ব'সে 'নিউসং' নামটি প্রথম শুনি। চিলির 'নুয়েভা কান্‌সিয়োন্‌।' ভিক্‌তর হারার গান।

কিউবার 'নুয়েভা ত্রোভা'। সিলভিও রোদ্‌রিগেসের গান।

নিকারাগুয়ার গানের কারিগর মেহিয়ো গোদোই।

এ এক বিরাট আন্দোলন। 'নিউ সং মুভমেন্ট।' — কত মানুষ গান লিখছে জীবনের খুঁটিনাটি দিক নিয়ে। নিজেকে নিয়ে। নিজের বাপ মা, ঠাকুর্দা ঠাকুমাকে নিয়ে। সন্তানকে নিয়ে। একটি চুমুও সে-গানের বিষয়। আবার সংগ্রামও। স্বপ্নের গান। দুঃস্বপ্নেরও। কান্নার গান। কান্নাভেজা হাসিও।

আমি ঘুরপাক খাচ্ছি এই গানের আন্দোলনে।

"Oh, come smile with us
Smile to make the days seem
less like years,
Oh, come smile with us
Smile beneath your tears."

— Holly Near

* * *

১৯৭৬ সাল। পূর্ব জার্মানি থেকে বিতাড়িত গানের কারিগর হুলফ্ বিয়ারমান গান গাইছেন পশ্চিম জার্মানির কোলন শহরে। সাধারণ সার্ট-ট্রাউজার্স পরা। মাঝ-বয়সী। হাতে একটা কনসার্ট গিটার। গানের বিষয় কখনও একজন দলছুট শ্রমিক, কখনও কোনো পলাতক কবি, কখনও একটা স্বপ্ন।

বিয়ারমান গাইছেন। শ্রোতাদের সঙ্গে কথা বলছেন। কবিতা পড়ছেন। আবার গাইছেন।

* * *

১৯৮৬ সাল। কলকাতা আমি বিয়ারমানের একটি গানকে, একটি চেতনাকে ধরতে চাইছি বাংলা ভাষায় :

এই ভাঙাচোরা দেশে আর কী হবে বলো
কী হবে ভাঙা স্বপ্ন নিয়ে
কী হবে বলো তোমার আমার
কী হবে বলো বন্ধুদের—
এখানে আমার ভালো লাগছে না, তবু
এখানেই থেকে যেতে চাই আরও বেশি।

* * *

১৯৯৬ সালের সেপ্টেম্বর মাস। কলকাতা। লেকটাউন থেকে দীপ্তীশ গঙ্গোপাধ্যায় ও তাঁর পরিবার একটি চিঠি লিখেছেন। চিঠির একপাশে স্টেট্‌স্‌ম্যান পত্রিকার একটি খবর কেটে সাঁটা। খবরের বিষয় ঃ ওড়িশায় পুলিশ কনস্টেবলের চাকরির জন্য তাগদের পরীক্ষা দিতে গিয়ে 'সান স্ট্রোকে' কয়েকজন প্রার্থীর মৃত্যু।

চিঠিটি এইরকম :

প্রিয় সুমন চট্টোপাধ্যায়,

কালকের স্টেট্‌সম্যানে পাশের খবরটা দেখে অনেক দিন আগে শোনা (হয়ত 'কলামন্দিরে' কোনো এক অবিস্মরণীয় সন্ধ্যায়) ভরাট গলায় "সঞ্জীব পুরোহিত হাঁটলেন" মনে প'ড়ে গেল...

জানি না, সাম্প্রতিক ভুবনেশ্বরের এই ঘটনার ওপর কোনো গান বাঁধা হ'ল কিনা। একটু জানাবেন?

* * *

মানুষের জন্য গান। মানুষ নিয়ে, ঘটনা নিয়ে, ইচ্ছে অনিচ্ছে নিয়ে, জীবন মৃত্যু নিয়ে, সুখ দুঃখ, স্বপ্ন দুঃস্বপ্ন নিয়ে —

* * *

১৯৯৫ সাল। এক যুবকের চিঠি ঃ

শ্রীচরণেষু সুমনকাকু,

.... বছর তিনেক আগে একবার সাংঘাতিক রকম নার্ভাস ব্রেকডাউনের শিকার হয়েছিলাম। সাইকিয়াট্রিস্টের শরণাপন্ন হতে হয়েছিল আমাকে। ঐ সাইকিয়াট্রিস্ট ভদ্রলোকই অন্যান্য ওষুধের সঙ্গে আমাকে বলেছিলেন, আপনার 'তোমাকে চাই' ক্যাসেটটা শুনতে। এবং আমি মনে করি, আমার আরোগ্যের ক্ষেত্রে ডাক্তারবাবুর ওষুধের চেয়ে আপনার গানের ভূমিকা অনেক বেশি।...."

* * *

গানের ভূমিকা?

* * *

১৯৭১-৭২ সাল। কলকাতা।

জটিলেশ্বর মুখোপাধ্যায়ের একটি গান শুনছি :

"এ কোন সকাল
রাতের চেয়েও অন্ধকার।
একি সূর্য নাকি স্বপ্নের চিতা
একি পাখির কুজন নাকি হাহাকার।"

গড়িয়ার খালে ভেসে যাচ্ছে এক যুবকের মৃতদেহ। এ-লখিন্দরের কি কোনো বেহুলা থাকতে নেই?

একজন পুরাতত্ত্ববিদ আমায় একবার বলেছিলেন — গড়িয়ার খালটাই নাকি গাঙুর ছিল।

যুবকটির পিঠে একটা ছোরা তখনও গাঁথা রয়েছে। সকালবেলা আপিস যাওয়ার পথে দেখছি।

*　　*　　*

১৯৭১-৭২ সাল। কলকাতা। পাড়ায় ঢোকার রাস্তার দু'পাশে সি. আর. পি. সেপাইরা বন্দুক হাতে। আপিস যাচ্ছি। কুৎসিত গালাগাল দিচ্ছে সেপাইগুলো পথচারীদের লক্ষ্য করে। কেন? উদ্দেশ্য : খোঁচানো। রেগে গিয়ে কেউ কিছু বললেই হয়তো গুলি চালিয়ে দেবে। লজ্জায়, অপমানে মুখ নিচু ক'রে আমরা চলেছি। গায়ে মাখছি না। অন্তত চেষ্টা করছি না মাখতে। — ছোট্ট একটি ছেলে, কাঁধে স্কুলের ব্যাগ, ছুটে এসে আমার হাত ধরল। চোখমুখে শুধু ভয় আর ভয়।

"কাকু, আমায় রাস্তাটা পার ক'রে দাও, আমার ভয় করছে।"

চিরকালের জন্য আমার মনের মধ্যে থেকে গেল ছবিটা : খোলাবন্দুক হাতে সেপাইদের সামনে থরথর ক'রে কাঁপছে ছোট্ট একটি ছেলে।

ছেলেটা এখন কোথায় থাকে? কী করে? কী ভাবে?

"আজ থেকে বুঝি আমার
রাত্রি ফুরিয়ে যাওয়া ফুরলো
আজ থেকে বুঝি আমার
দিনের আকাশ পথ হারালো"

— জটিলেশ্বর মুখোপাধ্যায়

*　　*　　*

১৯৭৩ সাল। ফ্রান্স।

বন্ধুর বাড়িতে গ্রামোফোন রেকর্ডে একটা লোক খোনা খোনা গলায় গাইছে :

What did you hear
My blue eyed son
What did you hear
My darling young one?
I heard the roar of a thunder
That roared out a warning
I heard the roar of a wave
That could drown the whole world
I heard then thousand drummers
Whose hands were a-blazing
I heard one person starve
And many people laughing
I heard the thousand whispering
And nobody listening
I heard the sound of a clown
Who cried in the alley....."

বব ডিলানের গান শুনছি জীবনে প্রথম। দেশের সেপাইদের বন্দুকের সামনে, তাদের গালাগালির সামনে ভয়ে কেঁপে কেঁপে ওঠা সেদিনের সেই ছোট্ট ছেলে, তুমি কি কখনও শুনতে পেয়েছ এই গান?

*　　*　　*

১৯৮৭ সাল। কোলোন, জার্মানি।

মাঝরাত পেরিয়ে গিয়েছে। 'ডয়েট্‌শে ভেলে'র (জার্মান রেডিয়ো) বাংলা বিভাগে আমার টেবিলে ব'সে খবর তর্জমা করছি। বিভাগে আর কেউ নেই। রাতের ডিউটি একাই সামলাতে হয়। রাত একটা নাগাদ স্টুডিয়োয় গিয়ে খবর আর সংবাদ সমীক্ষা পড়তে হবে।

চার দিক নিঝুম। এই সময়ে তিরিশ তলা এই প্রকাণ্ড বাড়িটায় কুল্লে বিশ জন কর্মী থাকেন কিনা সন্দেহ।

কেন জানি না, ডিলানের 'ব্লোয়িং ইন্ দ্য উইন্ড' গানটা মাথার ভেতর ঘুরছে সমানে। এমন একট সময়ে, খবর তর্জমা করতে করতে এই গানটাই-বা মনের ভেতর ঘুরঘুর করছে কেন!

হঠাৎ একটা কাগজে নিজের প্রায় অজান্তেই যেন লিখে ফেললাম :

'প্রশ্নগুলো সহজ আর উত্তরও তো জানা'।

লেখার সঙ্গেসঙ্গেই প্রথম লাইনগুলো যেন আপনিই বেরিয়ে এলো :

'কতটা পথ পেরোলে তবে
　　পথিক বলা যায়,
কতটা পথ পেরোলে পাখি
　　জিরোবে তার ডানা,
কতটা অপচয়ের পর
　　মানুষ চেনা যায়,
প্রশ্নগুলো সহজ আর
　　উত্তরও তো জানা।'

ডিলানের গাওয়া 'ব্লোয়িং ইন্ দ্য উইন্ড' প্রথম শুনেছিলাম ১৯৭৩ সালে ফ্রান্সে। সেই থেকে গানটা আমার পিছু ছাড়েনি। কখনও রেহাই দেয়নি আমায়। কত চেষ্টা যে করেছি ঐ গানটা থেকে একটা বাংলা গান বাঁধতে! বছরের পর বছর।

তের-চোদ্দ বছর পর হঠাৎ একদিন লাইনগুলো বেরিয়ে এল। কোথা থেকে? কী করে? — এর উত্তর অজানা।

*　　*　　*

মানুষের জীবনে যখন যেটা হয়, সেটা কি ঠিক সময়ে হয়? সব কিছুরই কি একটা সময় থাকে?

"To everything (Turn, Turn, Turn)
There is a season (Turn, Turn, Turn)
And a time for every purpose
Under heaven."

— Pete Seegar

*　　*　　*

সালটা কি ১৯৮৩? আমেরিকায় ব'সে 'অন্য আমেরিকা' নামে একটি বই লিখব ব'লে তোড়জোড় করছি। মার্কিন যুক্তরাষ্ট্রের প্রতিষ্ঠানবিরোধী লেখক, শিল্পী, বিজ্ঞানী, সমাজকর্মীদের সাক্ষাৎকার নেব। অনেক খুঁজে খুঁজে পীট সীগারের টেলিফোন নম্বর জোগাড় করেছি।

পীটের সঙ্গে কথা বলছি টেলিফোনে। অবিশ্বাস্য!

দীর্ঘ সাক্ষাৎকার। অনেক রাতে টেলিফোন। এই সময়ে টেলিফোন করতে বেশি খরচ হয় না, তাই তিনি মাঝরাত্তিরে ফোন করতে বলেছেন।

জগদ্‌বিখ্যাত এই প্রবীণ মানুষটি প্রায় সারারাত জেগে অনর্গল কথা ব'লে চলেছেন। প্রতিটি প্রশ্নের জবাব দিচ্ছেন সবিস্তারে। একটুও ক্লান্তি নেই।

মার্টিন লুথার কিং-এর দুনিয়া-কাঁপানো 'আই হ্যাভ আ ড্রিম' ভাষণ ও তাঁর বিখ্যাত পদযাত্রার বিশতম বার্ষিকী পালিত হচ্ছে ওয়াশিংটন ডি. সি.তে। ক্যাপিটলের সামনে 'ওয়াশিংটন মল'-এ (ময়দানে) লাখ পাঁচেক মানুষ।

বিশাল মঞ্চে গান হচ্ছে, ভাষণ চলছে। মঞ্চের এক পাশে একজন হাত নেড়ে সাংকেতিক ভাষায় সেগুলি অনুবাদ ক'রে চলেছেন সমানে। নয়তো, যাঁরা বধির, তাঁরা যে বুঝতে পারবেন না।

গানের সময়ে সেই অনুবাদক দুই হাতের নানান সাংকেতিক মুদ্রার সঙ্গে তালে তালে নাচছেন যেন!

প্রতিবন্ধীদের কথা যাঁরা এতটা, এভাবে ভাবতে পারেন, তাঁদের সামনে আমি নতজানু।

*　　*　　*

লিন্‌কন্‌ মেমোরিয়ালের সিঁড়িতে পীট সীগার গাইছেন। লক্ষ লক্ষ মানুষের মধ্যে দাঁড়িয়ে আমিও শুনছি। মার্টিন লুথার কিং-এর স্ত্রী কোরেটা কিং ভাষণ দিচ্ছেন। আমরা শুনছি। আবার গান।

সমাবেশের পর পদযাত্রা। বুড়ি বছর আগে মার্টিন লুথার কিং বর্ণবিদ্বেষের বিরুদ্ধে, জাতি সম্প্রতির পক্ষে এমন পদযাত্রা করেছিলেন।

কত রাজ্য, কত দেশের মানুষ এসেছেন এই পদযাত্রায় সামিল হতে। একটি আমেরিকান যুবকের হাতে একটি পোস্টার। তাতে লেখা : 'আমি এসেছি অনেক দূরের একটা গ্রাম থেকে। গ্রামবাসীরা চাঁদা তুলে আমাকে পাঠিয়েছেন।'

আমেরিকায় কত কত দেশের মানুষ ঠাঁই নিয়েছেন। কত ভারতীয়, বাংলাদেশি, পাকিস্তানিও তো আছেন। কিন্তু এই তিন দেশের কোনো প্রতিনিধি দল নেই। আমেরিকা প্রবাসী উপমহাদেশীয়রা কি সমবেতভাবেও একটি প্রতিনিধিদল পাঠাতে পারতেন না?

এই বিশাল সর্বজাতির সমন্বয়কারী সমাবেশে উপমহাদেশীয় বলতে উপস্থিত শুধু আবদুল্লাহ আল-ফারুক, সোহেল রহমান, সোগোফতা নাস্‌রিন হক আর আমি। চারজনেই বাঙালি। প্রথম তিনজনই বাংলাদেশের। আমরা চার বন্ধু। তিনজন ভয়েস অফ আমেরিকার সহকর্মী। সোহেল আর—এক সহকর্মীর ছেলে।

লক্ষ লক্ষ মানুষের সঙ্গে আমরা হাঁটছি আর নিজেদের মধ্যে বলাবলি করছি — আমেরিকাপ্রবাসী উপমহাদেশীয়রা যদি প্রতিনিধি দল পাঠাতেন?

কেন পাঠালেন না?

তাঁরা কি তবে নিজেদের এই বর্ণবিদ্বেষ-বিরোধী, শান্তিবাদ সমাবেশের সঙ্গে মেলাতে পারলেন না? তাঁরা আমেরিকায় থাকবেন, ডলার কামাবেন, অথচ মার্কিন জনগণের সৎ সংগ্রামে সামিল হবেন না?

* * *

পীট সীগার একদিন কথা প্রসঙ্গে আমায় বললেন —

"Think globally, but act locally."

* * *

১৯৯৪ সাল। কলকাতা। খুব ইচ্ছে, বিদেশ থেকে একটা বারো-তারের গিটার আনার। খোঁজ নেওয়ার জন্য পীট সীগারকে লিখলাম। উনি জানালেন — "এখানে ওরকম গিটারের বেজায় দাম। তুমি কেনার কথা ভেবো না। আমি আমার গিটারটা পাঠিয়ে দিচ্ছি।"

কোনো আপত্তি শুনলেন না। পাঠিয়ে দিলেন।

এইচ. এম. ভির স্টুডিয়োয় হিমাংশু দত্তর গান রেকর্ড করছি। সুদীপ্ত চট্টোপাধ্যায় এসে উপস্থিত পীটের গিটার হাতে। ওর হাত দিয়েই পাঠিয়ে দিয়েছেন তিনি, আমার ওপর তথ্যচিত্র তুলতে সুদীপ্ত কলকাতায় আসছেন জেনে।

যন্ত্রশিল্পীদের মধ্যে বুদ্ধ গঙ্গোপাধ্যায় নিজের বারো-তারের গিটার বাজাচ্ছিলেন। আমি তাঁকে বললাম — তিনিই উপযুক্ত শিল্পী, তাঁর হাতেই পীট সীগারের গিটারটির উদ্বোধন হোক কলকাতায়। বুদ্ধ সলজ্জ ভঙ্গিতে পীটের গিটারটি সুরে বেঁধে বাজালেন রেকর্ডিং-এ।

বেস-গিটার ও ছ'তারের এক্‌স্টিক গিটার-শিল্পী নেপাল সাউ এগিয়ে এসে প্রণাম করলেন পীটের গিটারটিকে।

পীট সীগার, আপনি আশীর্বাদ করুন আপনার এই সন্তানদের!

* * *

১৯৯৬। অনেক অপেক্ষা, অনেক চেষ্টার পর পীট সীগার অবশেষে আসছেন কলকাতায়। বারো বছর আমাদের দেখা হয়নি। তিনি চিঠি লিখছেন :

Dear Suman,

It will be wonderful to share a concert with you, and we can compare the similarities and differences in our approach and our songs. .....

See you in Now!
Pete

আমি আবার নতজানু।

* * *

পয়লা অক্টোবর, ১৯৯৬। আজ সকালে এই গানটি লিখে ফেললাম:

Song for Pete

A song for peace
A song for love
It looks at you
And seeks above
A common sky
Where our visions meet —
A song for peace
It a long for Pete.
A song for peace
A song for the soul
It looks for you
And a common goal
Where we share a song
And our voices meet —
A song for peace
It a song for Pege
A song for peace
A song for tomorrow
It needs us all
Our joy and sorrow
A common fate
To hell with hate
In love we meet
A song for Pete.

পীট সিগারের সঙ্গে কিছুক্ষণ

সুমন : পীট, আপনার নিজের সম্পর্কে দু'এক কথা বলুন, শুনি। এই যেমন কবে ও কোথায় আপনার জন্ম, ছেলেবেলা কোথায় কেটেছে, গানবাজনায় হাতে খড়ি হলো কী ক'রে — এইসব।

পীট সিগার : আমার বয়েস এখন ৬৫। জন্ম নিউইয়র্ক শহরে। আমার বাবা মা দু'জনেই ছিলেন পেশাদার সঙ্গীতশিল্পী। আমরা মা প্যারিসে বেহালা শিখেছিলেন। বাখ্, বেঠোফেন, ব্রাম্‌স আর দেবুসির জমকালো ঐতিহ্যে। তারপর ৬০ বছর শিক্ষকতা করেন আমার মা। আমার বাবার শিল্পীজীবন শুরু "আর্ভ্যাঁ গার্দ" সঙ্গীতরচয়িতা হিসেবে। তারপর বেচারি বধির হয়ে যান। শোনার ক্ষমতা চলে যাবার পর আমার বাবা আবিষ্কার করলেন যে সঙ্গীত বিষয়ে তত্ত্বকথা লেখাতেই তাঁর সবচেয়ে আনন্দ। তিনি সঙ্গীত রচনা আর তত্ত্ব শেখাতেন। শেষে হয়ে দাঁড়ালেন সঙ্গীতের তাত্ত্বিক। তিনি "সোসাইটি অফ মিউজিকোলজি" প্রতিষ্ঠা করেন। পরে তিনি "সোসাইটি অফ এথনো-মিউজিকোলজি" নামে একটি প্রতিষ্ঠানও গড়ে তোলেন। সেই নিয়েই সবচেয়ে বেশি ব্যস্ত ছিলেন। দুনিয়ায় যতো জাতি, তাদের সঙ্গীত নিয়ে চর্চা করতেন তিনি। ৯২ বছর বয়সে মারা যান আমার বাবা, এই তো কয়েক বছর আগে। আমার বাবাই আমায় সঙ্গীতে টেনে আনেন। আমার মায়ের দৃষ্টিভঙ্গিটা ছিল খুব পোশাকী। তাঁর কথা ছিল : বাপু, ভালো করে শেখো, লেখাপড়া কর, চর্চা কর, তারপর শিখে নাও কোনটা ভালো আর কোনটা খারাপ। আমার বাবা কিন্তু বলতেন : না, নানান ধরনের জিনিস শোনো, একধার থেকে নানা রকমের গান আর বাজনা। তারপর নিজেই বুঝে দেখো কোনটা তোমার ভালো লাগে আর কোনটা লাগে না।

আমি কিন্তু আসলে সঙ্গীতশিল্পী হতে চাইনি। সাংবাদিক হতে চেয়েছিলাম। কিন্তু ১৯৩৮ সালে আমি হার্ভার্ড কলেজ ছেড়ে বেরিয়ে পড়ে দেখলাম যে কোনো পত্রিকাতেই আমার চাকরি হচ্ছে না। আমার কয়েকজন আত্মীয় ছিলেন, ইস্কুলে পড়াতেন। তাঁরা আমায় ডাক দিলেন: ওহে, এসো, ছেলেমেয়েদের গান শোনাও, আমরা তোমায় পাঁচ ডলার দেব। আমার তখন মনে হয়েছিল, যে কাজটা আমি স্রেফ মনের আনন্দে করে থাকি, সেই কাজটার জন্যই এবার আমি পয়সা চুরি করছি যেন। যাই হোক, আমি গেলাম, গান গাইলাম এবং টাকাটাও নিলাম দিব্যি। সেই থেকে আর কোনোদিন আমি কোনো সৎ চাকরির খোঁজ করিনি।

সুমন : আপনি বললেন আপনার বাবার কাছেই সঙ্গীতে হাতেখড়ি আপনার। কিভাবে শেখাতেন আপনার বাবা? এই যেমন প্রথমে কী শিখলেন আপনি, কণ্ঠসঙ্গীত নাকি পিয়ানো?

পীট সিগার : তিন বছর বয়েস থেকে আমি হাতের কাছে যা পেয়েছি, বাজিয়েছি। মহা আনন্দে। দুমদাম। এলোপাথাড়ি। কানে শুনে শুনে পিয়ানোয় দমাদ্দম বাড়ি দিতাম। শেখাটেখার ধার ধারিনি। যা পেতাম, বাজাতাম। এই যেমন অ্যাকর্ডিয়ন। শেষে ব্যান্‌জো ধরলাম। ১৪ বছর বয়সে ইস্কুলের জ্যাজ্ ব্যাণ্ডে ব্যানজো বাজাতে লাগলাম। মোটামুটি ঐ সময়ে আমার বাবা আমায় নিয়ে গেলেন এক সঙ্গীত উৎসবে। জায়গাটা দক্ষিণের পাহাড়ী অঞ্চল। সেখানকার লোক তখনো সনাতন প্রথা অনুসারে আপনমনে গাজবাজনা করত, ইস্কুল টিস্কুল যেত না। খুব জোরালো ঐতিহ্যের দাপট ছিল সেখানে। তাদের বেহালা আর ব্যান্‌জো বাজানোর সনাতন কায়দা শুনে আমি তো পড়ে গেলাম পাহাড়ী ব্যান্‌জোর প্রেমে। সেই থেকে অবশ্য কালক্রমে শিখেছি যে জগতে যত রকমের বিভিন্ন লোক, ঠিক ততরকমেরই বিভিন্ন লোকসঙ্গীত। আমার আফসোস হয় যখন ভাবি যে কেবল এক ধরনের লোকসঙ্গীত গোটাগুটি লোকসঙ্গীতের পরিচিতি পেল। এই সংজ্ঞা বড়ো সংকীর্ণ। প্রায় বছর কুড়ি আগে আমার স্ত্রী আর আমি আমাদের তিন ছেলেমেয়েকে ইস্কুল থেকে বের করে নিয়ে বেরিয়ে পড়লাম পৃথিবীর পথে। নানান দেশে গেলাম। প্রশান্ত মহাসাগর এলাকা, এশিয়া, আফ্রিকা আর ইউরোপের কত বিচিত্র, অনবদ্য সব সঙ্গীত শুনলাম। দু'সপ্তাহ কাটিয়েছিলাম আমরা ভারতে। ঐ দেশের সঙ্গীত যে কি দুর্দান্ত তার সামান্য একটু পরিচয় পাবার সুযোগ জুটেছিল সেবার।

সুমন : কোন বছরের কথা বলছেন?

পীট সিগার : ১৯৬৩।

সুমন : একসময়ে তো আপনি গান লেখা শুরু করলেন। প্রথমে কী ধরনের গান লিখতেন আপনি?

পীট সিগার : দেখুন, লেখার ব্যাপারটা কিন্তু আমার পরিবারে বরাবরই ছিল। হয় গদ্য, নয় পদ্য। বাবা আর মা দু'দিকেই। আমার ঠাকুর্দা ঠাকুমা, দাদু দিদিমা সকলেই লিখতেন। পেশাদার লেখকলেখিকা কেউ ছিলেন না অবশ্য। আমার এক কাকা ছিলেন। কবি। প্রথম বিশ্বযুদ্ধের সময় তাঁর লেখা একটা কবিতা বেশ নাম করেছিল। "আই হ্যাভ আ রঁদেভু উইথ ডেথ্।" যুদ্ধ করতে গিয়ে মারা যান ফ্রান্সে। আমার বাবা বলতেন আমার

পীট সিগার : ঠিক তাই। ঐ সুরটাকে কাজে লাগিয়ে নিজের একখানা গান বেঁধে ফেলতেন তিনি। মাঝেমধ্যে সুরটা একটু পাল্টে দিতেন অবশ্য। কখনও তিনি আবার একই সুরে কয়েক প্রস্থ কথা লিখে ফেলতেন। মূল লেখাটা হয়ে যাবার পর প্রায়ই উডি গাথ্‌রি গানটা এখানে ওখানে বদলে দিতেন। টাইপ করে লিখতেন তিনি। চমৎকার টাইপিস্ট ছিলেন। একখানা কার্বন কপি বানিয়ে রাখতেন সব সময়ে। উডি গাথ্‌রির সবচেয়ে বড়ো গুণ ছিল সারল্য। তাঁর কোনো গান এত সরল ও সাদাসিধে ছিল যে, লোকে প্রথমে বুঝতেই পারত না গান হিসেবে সেগুলো কি অসাধারণ। যেমন ধরুন :

"This land is your land
This land is my land
From California
To the New York island".

গানটা প্রথমে শুনে ভেবেছিলাম এ বড়ো সাদামাটা। খুব একটা দাঁড়াল না ব্যাপারটা। আমি ভুল ভেবেছিলাম। আজ ২৪ কোটি আমেরিকান ঐ গানটা জানেন।

সুমন : গান লেখার ব্যাপারে উডি গাথ্‌রিই কি আপনার প্রথম প্রেরণা?

পীট সিগার : বলতে পারেন। তাঁর কাজের ধরন দেখে গান লিখতে চেষ্টা করার, গান লেখার উৎসাহ পেয়েছিলাম আমি। আমি নিজে যে গান লিখতে পারব এটা আমি কোনোদিনই ভাবিনি। কিন্তু তিনি কিভাবে কাজ করছেন দেখে আমিও চেষ্টা করতে লাগলাম। ছোটখাটো কিছু সাফল্যও এল। দেদার গান লিখে যাবার ক্ষমতা আমার কোনোদিনই নেই। লোকে গাইতে পারে এমন গুটিকয়েক গান যে লিখতে পেরেছি, এটাই আমার সৌভাগ্য বলতে পারেন। আমার জীবনে, পঞ্চাশটি বছর ধরে আমি শ'খানেক কি শ'দুয়েক গান লেখার চেষ্টা করেছি। তবে আমার মতে তার বেশিরভাগই ভুলে যাওয়া ভালো।

সুমন : আপনার প্রথম লেখা গানগুলো কি ধরনের ছিল?

পীট সিগার : কয়েকটা ছিল দর্শনঘেঁষা। মাঝেমধ্যে মজার গানও লিখতাম। তবে সাধারণভাবে আমার প্রবণতাটা একটু বেশিরকম তাত্ত্বিক। আমি কালক্রমে এই সিদ্ধান্তে এসেছি যে তাত্ত্বিক গীতিকার দু'ভাবে কাজ করেন। বাস্তব সম্পর্কে তাঁদের মনোভাব দু'ধরনের, এই দুয়ের সমন্বয় বিরল। আপনাকে একটা উদাহরণ দিই। শিল্পী কী করবেন — না তিনি

কাকাটি মহামূর্খ। বলতেন : "ঐসব যুদ্ধেটুদ্ধে ওর জড়াবার কী দরকার ছিল? ওকি জানতো না যে ফ্রান্সের শাসকশ্রেণী জার্মানির শাসকশ্রেণীর থেকে তেমন আলাদা জাতের নয়?"— প্রথম বিশ্বযুদ্ধের ঠ্যালায় আমার বাবা ঝুঁকেছিলেন র‍্যাডিক্যাল রাজনীতির দিকে।

সুমন : রাজনীতিতে আপনার হাতেখড়ি কি তাঁরই কাছে?

পীট সিগার : সে তো বটেই। একশোবার। আমার বয়েস যখন ১৪ আমার বাবা তখন আমায় নিয়ে গেলেন 'মে দিবসের' মিছিলে। সে এক মহা চাঞ্চল্যকর ঘটনা আমার জীবনে। লাখ লাখ লোক নিউ ইয়র্কের রাস্তায় মিছিল করে চলেছে। হাতে তাদের পোস্টার, তাতে লেখা : "এ দুনিয়ায় ফ্যাসিবাদ ছড়িয়ে পড়তে দিও না।" আমার মনে আছে, ১৯৩৮ সালে যেসব আমেরিকান স্বেচ্ছায় লড়তে গেলেন স্পেনে, আমি তাঁদের সমর্থন করেছিলাম। তখন যেসব গান শিখেছিলাম তার কয়েকটা আজও আমার বড়ো প্রিয়। ফ্রাংকোর জমানা শেষ হবার পর আমি স্পেনে গিয়ে ঐসব গান কয়েকটা গেয়েছিলাম। মাদ্রিদে সাত হাজার মানুষ আমার সঙ্গে গলা মিলিয়ে গান গাইলেন স্প্যানিশ লয়ালিস্টদের গান। আমি শুধোলাম : 'আচ্ছা যেসব স্তবক আমার জানা, সেগুলো আপনারা জানলেন কী করে?" কারণ সকলেই ঐ গানগুলো গায় একটু পাল্টে, একটু নিজের মতো ক'রে। শ্রোতারা বললেন : "কেন জানব না? আপনার রেকর্ডগুলো তো আমাদের শোনা।" (হাসি)

সুমন : পীট, আপনি কিভাবে গান লেখা শুরু করলেন এই প্রশ্নের উত্তর কিন্তু এখনও পেলাম না। কৌতূহলটা রয়েই গেছে। এবারে বলুন কিভাবে শুরু করলেন। প্রথমে কি কবিতা লিখতেন?

পীট সিগার : হ্যাঁ, প্রথমে আমি কবিতা লিখতাম। কিন্তু তারপর উডি গাথ্‌রির সঙ্গে আমার পরিচয় হল। আমার শিক্ষার অনেকটা জুড়ে রয়েছেন উডি গাথ্‌রি। ছোটখাটো মানুষটি। মাথায় কোঁকড়া চুল। চেহারায় খাটো হলে কি হবে তাঁর লেখার প্রতিভা ছিল অসাধারণ দুর্দান্ত। জীবনে পেল্লায় প্রতিভাঅলা যত জন লেখককে চিনেছি, উডি তাঁদের অন্যতম। জীবনের প্রতিটি দিন, সারাক্ষণ তিনি ছড়া লিখতেন, কবিতা লিখতেন, রগড়ের কথা লিখতেন। সাধারণত তাঁর গান লেখার পদ্ধতি ছিল এইরকম : একটা পুরোনো, খুবই পরিচিত একটা সুর নিয়ে তাতে নতুন কথা বসানো। ধরুন তিনি একটা সুর শুনলেন। সুরটা তাঁর ভালো লেগে গেল। অমনি তিনি বুঝলেন, অমনি তিনি.....

সুমন : তা থেকে তাঁর নিজের গান বানিয়ে ফেলতেন।

সুমন : পীট, আপনার পরিচিতি লোকসঙ্গীতশিল্পী হিসেবে। মার্কিন যুক্তরাষ্ট্রে "লোকসঙ্গীত" কথাটার অর্থ কী? লোকসঙ্গীতের একটা মোটামুটি সংজ্ঞা কি দিতে পারবেন?

পীট সিগার : দেখুন, সত্যি বলতে কি, এই নামটা আমি যতটা পারা যায় কম ব্যবহার করে থাকি। কেননা বেশিরভাগ লোক মনে করে লোকসঙ্গীতশিল্পী হল এমন একজন লোক যে কিনা একখানা ব্যান্‌জো বা গিটার হাতে মাইক্রোফোনের সামনে দাঁড়ায়। আমি মনে করি এই সংজ্ঞাটা ভুল। আমার মতে, যে লোকটা কানে শুনে শুনে গান শেখে এবং সেই গান স্রেফ মনের আনন্দে, গান গাওয়ার আনন্দে গায়, সেই হলো লোকসঙ্গীতশিল্পী বা গায়ক। তাঁরা হয়তো আজ মাইক্রোফোনের সামনে দাঁড়িয়ে। কিন্তু আগেকার দিনে তো আর এ সবের বালাই ছিল না। এবং আগেকার দিনে যাঁরা মাইক্রোফোনের সামনে থাকতেন তাঁরাই যে সেরা লোকসঙ্গীতশিল্পী এটাও নিশ্চিতভাবে বলা যেত না।

দেখুন, একেবারে সেরা যেসব লোকগীতিকারকে আমি চিনি তাঁরা কেউই মঞ্চে ওঠেন না। তাঁরা স্রেফ নিজেদের পরিবার বা বন্ধুবান্ধবদের জন্য গানবাজনা করেন। দিনের কাজ চুকে যাবার পর এ হল সময় কাটানোর একটা উপায়। সেই সঙ্গে কিছু আনন্দ পাওয়া, মজা পাওয়া। তবে আমার আশঙ্কা লোকসঙ্গীতের ও লোকগীতিকারের ভুল সংজ্ঞাটার জন্য আমি আংশিকভাবে দায়ী। কারণ আমায় লোকে লোকসঙ্গীতশিল্পী বলেছে এবং আমি তো মঞ্চে উঠে, সামনে একটা মাইক্রোফোন রেখেই গান গেয়েছি।

সুমন : মার্কিন যুক্তরাষ্ট্রে লোকগীতি বলতে কি একই ধরনের গান বোঝায়, নাকি এটা নানা ধরনের গানের একটা সাধারণ নাম?

পীট সিগার : দুঃখের বিষয়, মার্কিন যুক্তরাষ্ট্রের প্রবণতাটা হল লোকগীতি বলতে এক ধরনের গান বোঝানো ও বোঝা। আমি লোকদের বোঝাতে চেষ্টা করি, না, তা নয়। অনেক ধরনের, নানা ধরনের গানই পড়ে এই দলে। কিন্তু এই বোঝানোর ব্যাপারে আমি খুব সফল হয়েছি বলে মনে হয় না। ক্যারিবিয়ান জনগণ যখন বঙ্গো ড্রামস বাজান, সেটা তো লোকসঙ্গীতই হয়। দক্ষিণ স্পেনের একজন গিটার বাজিয়ে ফ্লামেংকো বাজান যখন, তিনি তো তখন লোকসঙ্গীতই করছেন। আমার বাবা একবার একটা আলোচনামূলক নিবন্ধ লিখেছিলেন। তাঁর বক্তব্য ছিল, যা আপাতদৃষ্টিতে লোকসঙ্গীত মনে হচ্ছে সেটা আদতে লোকসঙ্গীত নাও হতে পারে, আবার যা আপাতদৃষ্টিতে লোকসঙ্গীত মনে হচ্ছে না সেটা

ছবি বা গল্প বা ভাস্কর্য বা একটা গানের মধ্য দিয়ে জীবনের একটা ফালি, একখানা টুকরো তুলে দেবেন আপনার হাতে। আর, যে লোকটা তা দেখছে, পড়ছে বা শুনছে, সে এবারে তা থেকে কিছু সিদ্ধান্ত টানবে। সৃষ্টির এই দিকটা তোলা থাকে ভোক্তার জন্য। ভালো শিল্পী কখনোই গোটা ছবিটাকে আঁকেন না। তিনি কেবল একটা অংশের কথা বলেন। আপনার কাজ হল ছবিটা সম্পূর্ণ করা। তাত্ত্বিক কিন্তু উল্টো দিক ধরে এগোন। তিনি জীবনের অনেক, অনেকগুলি ফালি, অনেকগুলি অংশের দিকে দৃষ্টি দেন। এবং এই বহুর মধ্যে থেকে তাত্ত্বিক নিজেই একটা সিদ্ধান্ত টানেন। বিজ্ঞানী ও তাত্ত্বিক চেষ্টা করেন কিছু নিয়ম, কিছু সূত্র ছকে ফেলতে। যিনি এই নিয়ম বা সূত্র খতিয়ে দেখবেন, বিজ্ঞানী ও তাত্ত্বিক তাঁরই হাতে তুলে দেন সেগুলো বিশেষ বিশেষ ক্ষেত্রে প্রয়োগ করার, ফলানোর দায়িত্ব। এটা শিল্পীর দৃষ্টিভঙ্গির বিপরীত। অথচ দেখুন তাত্ত্বিক ও শিল্পী দু'জনেই বাস্তব সম্পর্কে কৌতূহলী। তাঁরা দু'জনেই দেখতে চান বাস্তবে ব্যাপারটা কী। এই বিশেষ পরিস্থিতিতে "সত্য" কোনটা। ভবিষ্যৎটা কেমনধারা হবে। অতীতটাই বা কেমন ছিল। অতীতের বর্ণনা সবচেয়ে ভালোভাবে দেওয়া যায় কী করে। কাজেই তাত্ত্বিক ও শিল্পী পরস্পরের বিরোধী নন। তাঁদের কাজের ধরনটাই যা আলাদা। মাঝে মাঝে দেখা যায় একজন ভাবুক দুটো কাজই অল্প অল্প করতে চাইছেন। লোকে বলে কার্ল মার্কস তরুণ বয়েসে কবি ছিলেন। কখন একজন গীতিকারও একটা গল্প বলার পর কোনো একটা সিদ্ধান্ত টানতে চান। উডি গাথ্‌রি যেমন এক বোম্বেটেকে নিয়ে একটা দারুণ ব্যালাড লিখে গেছেন। লোকটা ব্যাঙ্ক লুট করে বেড়াত। গানটায় বলা আছে আইনের হাত এড়ানোর জন্য লোকটা কিভাবে এখানে ওখানে ঘুরে বেড়াত। শেষে উডি গাথ্‌রি লিখছেন :

"Through this world you wander
You'll see lots of funny men
Some will rob you with a six gun
And some with a fountain pen".

কাউবয়দের পিস্তলকে বলা হত "সিক্স গান"। শেষের এই স্তবকটা হলো সিদ্ধান্ত। উপসংহার। এই অংশটা হয়তো না লিখলেও চলত। কিন্তু স্তবকটা বেশ ভালো। এবং এই গানটা যারা গায়, শেষের এই স্তবকটাও বাদ দেয় না তারা।

রীতিমতো লোকসঙ্গীত হতে পারে। মোদ্দা কথাটা ছিল : কোনটা লোকসঙ্গীত আর কোনটা লোকসঙ্গীত নয় তার মধ্যে স্পষ্ট দাগ টানা অসম্ভব। গোটা ব্যাপারটা মিলেমিশে একাকার, জগা খিচুড়ি। বিশেষ করে আজকের দুনিয়ায়। আগেকার দিনে, আদ্যিকালে হয়তো এই বিভেদটা স্পষ্ট ছিল যে ঐ প্রাসাদের ভেতরে যে সিম্ফনি অর্কেস্ট্রা বাজছে সেটা হল "ফাইন আর্টস মিউজিক", হাটেবাজারে যেটা হচ্ছে সেটা "পপ মিউজিক", আর যে কৃষকশ্রেণীর হাতে টাকা পয়সা নেই, যারা কানে শুনে শুনে স্রেফ নিজেদের জন্য গান করে তাদেরটা হল গিয়ে "পল্লীসঙ্গীত"। কিন্তু সেই যুগ চলে গেছে। এখনকার দিনে "লোক" এবং "সঙ্গীত" সবই জট পাকিয়ে গেছে, জড়িয়ে গেছে।

সুমন : কিন্তু ৬৫ বছর বয়সে, সঙ্গীতকার ও কণ্ঠশিল্পী হিসেবে অসাধারণ সাফল্যের পর এবং "লোকসঙ্গীতশিল্পী" হিসেবে দুনিয়াজোড়া নাম কেনার পর, পীট একজন আমেরিকান হিসেবে আপনি নিজে লোকসঙ্গীতের সংজ্ঞা দেবেন কিভাবে?

পীট সিগার : এই নামটা যদি একান্তই ব্যবহার করতে চান তো আমি বলব এ হল একটা প্রক্রিয়া। এক ধরনের গানের বা এক ধরনের গাইয়ের একটা শ্রেণী বলে ভাববেন না এটাকে। ভাবুন, এটা হল এক দীর্ঘদিনের, বহুকালের প্রক্রিয়া। কিসের প্রক্রিয়া? — না, পুরনো উপাদান উপকরণ-গুলোকে সমানে, একনাগাড়ে নতুন রূপে নিয়ে আসার প্রক্রিয়া। হয়তো পুরনো একটা আইডিয়াকে পাল্টে যুগোপযোগী করে তোলা হচ্ছে। হয়তো একটা পুরনো সুরকে পাল্টানো হচ্ছে আজকের প্রয়োজনে। হয়তো বা একাধিক পুরনো রীতির মধ্যে নতুন একট সমন্বয় আনা হচ্ছে, সেগুলো মিলিয়ে দেওয়া হচ্ছে। আর, বিশ শতকের সঙ্গীতের এটাই হল সবচেয়ে উল্লেখযোগ্য পরিণতি : নতুন সমন্বয়, কম্বিনেশন এটাই। আমি চোখ বুজে বলে দিতে পারি এটা দুনিয়ার অন্যান্য জায়গাতেও হচ্ছে আবার ভারতেও হচ্ছে। কয়েকটা নতুন সমন্বয় যাচ্ছেতাই। কিন্তু কয়েকটা হয়তো বেশ ভালোই হবে। এবং আমার আশার জোর এত যে আমি আস্থা রাখি বাজে কম্বিনেশনগুলোকে ভুলে গিয়ে লোকে ভালোগুলোকেই মনে রাখবে।

সুমন : আপনি কি বলতে চাইছেন লোকসঙ্গীত যে সাবেক ঐতিহ্যনির্ভর হবেই তার কোনো মানে নেই?

পীট সিগার : সাবেক ঐতিহ্য তো কিছু থাকবেই। কিন্তু সেটাই সব নয়। যিনি কাজটা করছেন তিনি হয়তো এখানে এক লাইন বা ওখানে এক লাইন পাল্টে দেবেন। কিন্তু এই "পাল্টানোর" চিন্তাটা যে তাঁর কোথা থেকে আসবে, কে বলতে পারে? পরিবর্তনটা খুব সনাতন রীতিতেও

হতে পারে, আবার সাবেক ঐতিহ্যের ধার তেমন না ধেরেও তো পরিবর্তন আসতে পারে।

সুমন : সঙ্গীত বাজার আর সঙ্গীত ইনডাস্ট্রির জন্য যেসব গান নিয়মিত তৈরি হয়ে থাকে সেগুলোর থেকে লোকসঙ্গীত কোন অর্থে আলাদা বলে আপনি মনে করেন?

পীট সিগার : দুনিয়ার প্রত্যেক দেশের মার্গ সঙ্গীতেরই আঙ্গিকসর্বস্ব হয়ে পড়ার একটা প্রবণতা দেখা যায়। তার কারণ, এ হল রীতিমতো পেশাদার সঙ্গীতকার ও শিল্পীদের সঙ্গীত। ওস্তাদরা চান তাঁদের শিক্ষাদীক্ষা ও দক্ষতার বৈশিষ্ট্যগুলো পরের প্রজন্মের হাতে তুলে দিয়ে যেতে। এবং এ ব্যাপারে তাঁরা খুবই খুঁতখুতে। সতর্ক। কঠোর। কাজেই জাপান বা চীন বা ভারত বা আফ্রিকায় বা অন্য যে কোনো দেশে বিরাট বিরাট ওস্তাদ আছেন। বড়োলোকেরা তাঁদের বায়না করেন গানবাজনা শোনার জন্য। তাছাড়া ছাত্রছাত্রীদের তাঁরা যত্ন করে শিখিয়ে দেন ঠিক কিভাবে গান বাজনা করতে হবে। মার্গ সঙ্গীত শুরু হয়েছে শ্রেণীসমাজ গঠিত হবার পর থেকে। ভেবে দেখুন, কৃষিবিপ্লবের আগে লোকে বাস করত দলবদ্ধভাবে। পুরুষরা শিকার করত, মেয়েরা ফলমূল কুড়োত, জোগাড় করে আনত। তখন সব পুরুষ একই শিকারের গান জানত। আর একই ঘুমপাড়ানী গানগুলো সব মেয়েরই জানা ছিল। তারপর একদিন কিছু চালাকচতুর লোক শিখে ফেলল কিভাবে গরু পুষতে হয়, গরুর পাল রাখতে হয়, চাষ আবাদ করতে হয়। এর ফলে কিছু লোক হয়ে পড়ল বড়োলোক আর কিছু হয়ে পড়ল গরিব। বড়োলোকেরা কালক্রমে গাইয়ে বাজিয়েদের টাকা পয়সা দিয়ে ডেকে আনতে পারত গানবাজনা শোনার জন্য। এইভাবে এক নতুন জাতের শিল্পী তৈরি হল যারা কিনা ওস্তাদ। আফ্রিকায় পেলাম আমরা তাল বাদ্যের ওস্তাদ। ইউরোপে পাওয়া গেল ওস্তাদ বেহালাবাদক। যেখানেই এই ওস্তাদরা আছেন, দেখা যায় তাঁরা বেশ আনুষ্ঠানিক, পোশাকী ও আঙ্গিকসর্বস্ব হয়ে উঠতে চাইছেন। কৃষকদের কিন্তু এরকম কিছু হয়ে ওঠার সময় ছিল না। তাঁরা গান গাইতেন স্রেফ আপন মনে, গাওয়ার ও গানের আনন্দে। প্রচণ্ড খাটাখাটুনির পর তাঁরা যদি একটু গানবাজনা করার জন্য সপ্তাহে কয়েক ঘণ্টার অবকাশ পেতেন তো সেটা তাঁদের পরম সৌভাগ্য। তাছাড়া তাঁরা ক্ষেতে খামারে কাজ করতে করতে স্বতঃস্ফূর্তভাবেই গান গেয়ে উঠতেন একে অপরের সঙ্গে গলা মিলিয়ে। এই গানে একটা সহজ, আগলহীন ব্যাপার ছিল যেটা মার্গ সঙ্গীতে মেলে না। "পপ্ মিউজিক' সৃষ্টি হল শহর পত্তন হবার পর।

মার্গ সঙ্গীত বেশ জাঁকিয়ে বসার এবং হাজার হাজার বছর ধরে লোকসঙ্গীত বেড়ে ওঠার পর তবেই কায়েম হল নগরসমাজ। এবং গাইয়েবাজিয়েরা দেখলেন হাটেরবাজারে গানবাজনা শোনালে কিছু পয়সা জোটে। আজকের দিনে "পপ্" সঙ্গীতের গুরুত্ব অন্য সব ধরনের সঙ্গীতকে ছড়িয়ে গেছে। গ্রামোফোন রেকর্ড ইত্যাদির দৌলতে এটা সারা দুনিয়ায় ছড়িয়ে পড়েছে। কিন্তু আমার মতে, "পপ্" এখন একটা মাঝামাঝি জায়গায় রয়েছে। "পপ্" সঙ্গীতকার লোকসঙ্গীত বা মার্গ সঙ্গীত থেকে একটা দুটো সুরের কলি চুরি করে নেন অম্লানবদনে। যতক্ষণ একটা ডলার বা একটা টাকা আয় করা যাচ্ছে ততক্ষণ তিনি তাঁর কাজ সম্পর্কে আহামরি মাথা ঘামান না। পয়সা এলেই হল। আর ঠিক এই কারণেই আমার মনে হয়, মার্গ সঙ্গীত বা লোকসঙ্গীতের চেয়ে "পপ্" সঙ্গীত বরং অনেক তাড়াতাড়ি পাল্টেছে। "পপ্" সঙ্গীতে একজন বাজারসফল হলে অমনি দেখা যায় অন্য অনেকে তাঁর নকল করছেন। তাঁরা হয়তো অন্য কিছু করছিলেন। কিন্তু অমুক লোকটা তমুক ধরনের গান করে বেশ দু'পয়সা কামাচ্ছে এটা দেখতে গিয়ে অমনি তাঁরা নিজেদের পথ ছেড়ে সেই অমুক লোকের পথ ধরেন যাতে তাঁদের হাতেও দুটো পয়সা আসে। কাজেই প্রতি বছরই দেখা যায় বাজারে আসল দাঁওটা মারার জন্য নতুন করে হুড়োহুড়ি পড়ে গেছে। এই ব্যাপারটা বেশ বোকাবোকা এবং দুঃখজনকও, কারণ কিছু কিছু "পপ্" সঙ্গীতশিল্পী শিল্পী হিসেবে আসলে খুবই ভালো। আমি তো মনে করি, ডিউক এলিংটন বিশ শতকের এক অন্যতম সেরা সঙ্গীতশিল্পী। আর কোনো কোনো "পপ্" সুর এত সুন্দর ও সার্থক যে লোকে আর সেগুলোয় হাত দেয়নি, অমনিই রেখে দিয়েছে। "গ্রিন স্লিভস" নামে ইংরাজি সুরটা যেমন ষোলো শতকের একটা "পপ্" সুর। সুরটা আজও তার আবেদন খোয়ায়নি। কে জানে, হয়তো এইরকমের সার্থক সুন্দর "পপ্" সুর আর পাওয়া যাবে। হয়তো ব্রডওয়ের বাজারি বিনোদন অনুষ্ঠানের কোনো সুর, লোকে যেটা আজ থেকে পাঁচশো বছর পরেও গাইবে। মূল গানের কথাগুলো লোকে হয়তো ভুলে যাবে ততদিনে। কিন্তু সুরটা লোকে গাইবে, বাজাবে — কারণ সে এক সুন্দর সৃষ্টি।

সুমন : এটা কি সম্ভব যে "পপ্" সুর একদিন হয়তো লোকসঙ্গীত হয়ে দাঁড়াবে?

পীট সিগার : একশোবার সম্ভব। গানের বিভিন্ন রূপ তো আর পরস্পরের থেকে বিচ্ছিন্ন নয়। মার্গ সঙ্গীতশিল্পী মাঝে মাঝে লোকসঙ্গীত থেকে সুর ধার করেন। লোকসঙ্গীতশিল্পীরা আবার মার্গসঙ্গীত থেকে আইডিয়া নিয়ে থাকেন।

সুমন : ভারতে আমরা "লোকসঙ্গীত" বলতে বেশিরভাগ ক্ষেত্রেই বুঝি পল্লী অঞ্চলে, পল্লীমানুষের তৈরি গান। মার্কিন যুক্তরাষ্ট্রেও কি "লোকসঙ্গীত" নামটা একই অর্থ বহন করে?

পীট সিগার : না। আমেরিকার শতকরা মাত্র পাঁচ কি দশ ভাগ আজ গ্রাম। তাছাড়া গ্রামেও রেডিও আর টেলিভিশন আছে। কাজেই এখানে ব্যাপারটা জগাখিচুড়ি। ভারতে হয়তো এরকম জট এখনও পাকায়নি, তবে কালক্রমে তা সম্ভবত পাকাবে।

সুমন : পীট, আপনি একজন সমাজসচেতন ও রাজনীতিসচেতন সঙ্গীতকার ও গায়ক হিসেবে পরিচিত। আপনার সঙ্গীতের, আপনার গানের সামাজিক ভূমিকা কী?

পীট সিগার : দেখুন, যদি প্রমাণ চান তো একটাও দিতে পারব না। কিন্তু আমার আশা, সঙ্গীত পৃথিবীতে শান্তি ও সুবিচার আনতে পারবে। এককালে লোকে বলত তরোয়ালের চেয়ে কলম বেশি জোরাল। সেটা প্রমাণিত হয়েছে বলে আমি মনে করি না। কলমের কিছু ক্ষমতা আছে কিন্তু তা যুদ্ধ আটকাতে বা থামাতে পারেনি। তিরিশ বছর আগে আমি ঠাট্টা করে বলতাম : 'গিটার একদিন বোমার চেয়ে শক্তিশালী হয়ে দাঁড়াবে।' কিন্তু তা এখনও হয়ে ওঠেনি।

সুমন : তবে কি মনে করব সঙ্গীতের ভূমিকা সম্পর্কে আপনার একটা মোহভঙ্গ হয়েছে?

পীট সিগার : না, মোহভঙ্গ হয়নি আমার, যদিও আগে যতটা আশাবাদী ছিলাম ততটা আর নই। অবশ্য আমি এখনও মনে করি যে মানব জাতির বাঁচার সুযোগ আছে। তবে আমি এটাও বিশ্বাস করি যে লোকে যতটা বোঝে তার চেয়েও ঢের বড়ো ধরনের বিপদের মুখোমুখি রয়েছি আমরা আজ। প্রযুক্তি যত উঁচু মানের হবে, শাসকশ্রেণী ততই অজেয় হয়ে উঠবে। ওয়াশিংটনের সি আই এ আজ যে-কোনো জায়গায় টেলিফোনে আড়ি পাততে পারে, পৃথিবীর নানা জায়গায় নির্বাচনের ওপর প্রভাব ফেলতে পারে.....

সুমন : কে বলতে পারে হয়তো আমাদের এই কথাবার্তাও কেউ আড়ি পেতে শুনছে।

পীট সিগার : সেটা খুবই সম্ভব। কে বলতে পারে? — কাজেই, সাধারণ মানুষের শুভবুদ্ধি জয়ী হবে বলে এককালে আমার যে বিরাট আশা ছিল সেটা আজ আর আমার নেই। সাধারণ মানুষ বিলক্ষণ বোঝে যে আমরা, দুনিয়ার মানুষ একে অপরের সঙ্গে মিলেমিশে থাকতে পারি। সবার সঙ্গে

হয়তো আমাদের মতামত পুরোপুরি মেলে না। কিন্তু তাই বলে পরস্পরকে খুন করার হুমকি দেবারও কোনো দরকার নেই আমাদের। কিন্তু আমাদের সরকারগুলো কোনো না কোনো ভাবে উচ্চাভিলাষী লোকগুলোকে হাতিয়ে ফেলে, তারপর টেলিভিশন, পত্রপত্রিকা, শিক্ষাব্যবস্থা ইত্যাদির সাহায্যে এবং অন্য যাবতীয় হাতিয়ার ও মাধ্যমের সাহায্যে সরকারগুলো জনগণকে বোঝাতে চায় যে আমাদের হাতে বন্দুক আর বোমা থাকা দরকার নয়তো ও-পাড়ার ঐ সাংঘাতিক লোকগুলো আমাদের ভিটেয় ঘুঘু চরাবে। অথচ দেখুন কোথা থেকে যে কী হয়ে যায়, কোনটা যে কোন কাজে লাগে তা বলা মুশকিল। গানের সাহায্যে কাজের কাজ অবশ্যই হয়েছে। আমি মনে করি মার্কিন যুক্তরাষ্ট্রকে ভিয়েতনাম থেকে টেনে বের করে আনার ব্যাপারে গান খুব বড়ো একটা ভূমিকা নিয়েছিল। গানের ঐ ভূমিকাটির জন্য আমার গর্বের শেষ নেই। আগেই বলেছি, অঙ্কের হিসেবে আমি কিছুই প্রমাণ করতে পারব না। কিন্তু ১৯৬৯ সালের ১১ই নভেম্বর ওয়াশিংটন ডিসিতে পাঁচ লক্ষ মানুষ এক সঙ্গে গলা মিলিয়ে গেয়েছিল : *"Oh we are saying that give peace a chance"*

ঘুরিয়ে ফিরিয়ে বারবার গেয়েছিলাম আমরা এটা। গানটা লিখেছিলেন জন লেনন যিনি একসময়ে বীটলস দলে ছিলেন। এক তরুণীর কাছ থেকে শিখে নিয়েছিলাম গানটা। রেকর্ডটা তাঁর শোনা ছিল। আমি কোনোদিন শুনিনি। যাই হোক সেদিন সেই জনসমাবেশে আমি বারবার গাইলাম গানটা। সেই বিপুল জনসমষ্টিও গাইতে লাগলেন আমার সঙ্গে। আমি তাঁদের গাইয়ে ছাড়লাম। অনেকবার করে। এবং রাষ্ট্রপতি নিক্‌সন তার অনেক পরে একসময়ে লিখেছিলেন — তখন অবশ্য তিনি আর রাষ্ট্রপতি নন, তিনি লিখেছিলেন যে, স্বদেশে একটা রীতিমতো বিপ্লবের ভয় তাঁর না থাকলে তিনি ভিয়েতনামের ওপর অ্যাটম বোমা ফেলে দিতেন। ওয়াশিংটন ডিসি'র সেই সমাবেশে সেদিন পাঁচ লক্ষ লোক ভিড় করেছিল। নিক্‌সন বোমাটা ফেললে হয়তো সত্তর লক্ষ লোক জমা হত। এ দেশের প্রতিটি শহরে, গঞ্জে লোকে রাগে ফেটে পড়ত। নিক্‌সনকে আমরা কি নামে ডাকনাম জানেন? —"ট্রিকি ডিক্‌"। মহা চতুর লোক। যত দিন যাচ্ছে তত ভালো বুঝতে পারছি, টের পাচ্ছি আমরা ভদ্রলোক ঠিক কতটা চতুর ছিলেন। কূটবুদ্ধি খাটিয়ে অনেকগুলো কাজ করেছিলেন তিনি। এখানে কিছু ছাড় দিলেন, ওখানে একটু পিছিয়ে গেলেন। এবং এইভাবে তিনি নিজে সফল হতে না পারলেও যুক্তরাষ্ট্রের শাসকশ্রেণীর অবস্থাটা তিনি কোনরকমে সামাল দিতে পারলেন। ফলে হলো কী, তার কিছু বছর পর সত্তর বছরের এক অভিনেতা আমাদের রাষ্ট্রপতি হতে পারলেন।

সুমন : পীট, আপনি যখন জনতার সামনে গান করেন তখন আপনার প্রধান লক্ষটা কী থাকে? প্রথমেই কি আপনি শ্রোতাদের আনন্দ দেবার কথা ভাবেন?

পীট সিগার : ব্যাপারটা একটু মেশানো। আনন্দ আমি নিশ্চয়ই দিতে চাই। আমার গান শুনে লোকে যদি আনন্দ না পায় তো আমি মনে করি না যে আমি কোনো কাজের কাজ করতে পেরেছি। তবে সেটা কিন্তু আমার গোড়ার চিন্তা নয়। আমার প্রধান লক্ষ্য হলো শ্রোতাদের দিয়ে গান গাওয়ানো। আমার সঙ্গে গলা মিলিয়ে। পরে, সন্ধের শেষে দেখা যায় তাঁরা নিজের থেকে নিজে নিজেই গান গাইছেন। আমি শুধু গানের কথাগুলো জুগিয়ে যাচ্ছি তাঁদের। কখনও, কোনও কোনও গানে আমি হয়তো খাদের অংশটা অথবা হার্মোনির অংশটা গাই, আর তাঁরা গান আসল গানটা। অর্থাৎ আমি তাঁদের সঙ্গে সঙ্গত করি। এটা করতে পারলে তবেই আমি মনে করি যে একটা ভালো অনুষ্ঠান করলাম। কিন্তু শেষ পর্যন্ত যদি দেখা যায় যে সবকটা গান আমি খালি একা একাই গাইছি তাহলে আমার মনে হয় আমি ব্যর্থ হলাম। দেখুন, আমার নিজের গলা কোনোদিনই তেমন ভালো নয়। হ্যাঁ, আমি একটা সুর ধরতে পারি, ধরে রাখতে পারি। ছেলেবেলা থেকেই আমি "সং-লিডার" হিসেবে বেশ ভালো। একটা গুণ আমার বরাবরই ছিল। মানুষকে আমি কোরাসে গান গাওয়াতে পারি। জনতাকে শামিল করতে পারি, টেনে আনতে পারি গানের মধ্যে যাতে তারা সকলেই গলা মেলায়। এখন লোকের সামনে গান গাইতে উঠলে আমার সুবিধে থাকে এই যে শ্রোতাদের মধ্যে শতকরা দশ কি বিশজন হয়তো আগেও কোথাও না কোথাও গলা মিলিয়ে গেয়েছে আমার সঙ্গে। মাঝে মাঝে আর বেশি লোককেও পাই, আমার সঙ্গে গান গাওয়ার অভিজ্ঞতা যাদের আছে। কাজেই তারা অভ্যস্ত। আমার গান আগে শোনেনি এমন কেউ যদি সেখানে হাজির থাকে তো চারদিকে তাকিয়ে সে ভাববে —"আরে, এরা তো দেখছি সকলেই গাইছে গলা মিলিয়ে, তাহলে তো আমিও গলা মেলাতে পারি।"— এবং অনুষ্ঠানের শেষদিকে দেখা যায় শ্রোতাদের প্রায় সকলেই গান ধরেছে গলা ছেড়ে। তাদের গান যে কি সুন্দর এটা দেখতে পেয়ে তারা নিজেরাই অবাক হয়ে যায়। আমার মনে হয় এটা একটা কার্যকর প্রতীক। আমার মনে হয়, শেষবেশ আমরা যখন আরও গণতান্ত্রিক হয়ে উঠতে পারব তখন সারা দুনিয়া অবাক হয়ে দেখবে চেয়ে চেয়ে ঃ গণতন্ত্র কত সাফল্যমণ্ডিত হতে পারে।

সুমন : পীট, সাধারণভাবে দেখতে গেলে সমাজ ও সংগীতের সম্পর্ক কী?

পীট সিগার : এবং দশটি শব্দে এর উত্তর দিন..... হা হা (জোর হাসি)। বেশ, আমার আন্দাজ হলো, কথায় এর সঠিক উত্তর দেওয়া অসম্ভব। এ ব্যাপারে সত্যটা হলো একটা পেল্লায় কাঁটাঝোপের মধ্যে সেঁধিয়ে থাকা খরগোশের মতো। ভেতরে ঢোকার জো নেই। কেবল বাইরে থেকে আঙুল উঁচিয়ে আন্দাজে বলা — 'ব্যাটা বোধহয় ঐখানে কোথাও লুকিয়ে আছে।' আমি বলবো, সংগীত ও সমাজের সম্পর্কের সত্যটা হলো এই যে তারা একে অন্যের ওপর প্রভাব ফেলে এবং এ ওকে ছাড়া বাঁচতে পারে না।

সুমন : গীতিকার ও গায়ক হিসেবে আপনি কবে রাজনৈতিক আন্দোলনে ও ক্রিয়াকলাপে যোগ দেওয়া শুরু করলেন?

পীট সিগার : অনেককাল আগে। আমি তখন কিশোর। কেন্‌টাকির পাহাড়ী এলাকায় এক অসাধারণ মহিলা থাকতেন। আমাকে তাঁর কাছে নিয়ে গেলেন আমার বাবা। তিনি যে শুধু পুরোনো দিনের ব্যালাড আর নানা ধরনের সুন্দর সুন্দর আর মজার মজার গান গাইতেন তাই নয়, নতুন গান বাঁধার ক্ষমতাও তার ছিল। তাঁর নাম মলি জ্যাক্‌সন। আমরা তাঁকে ডাকতাম "আণ্ট মলি" বলে। মলি জ্যাক্‌সন একবার কয়লাখনি শ্রমিকদের ধর্মঘটে জড়িয়ে পড়েছিলেন। তাঁর স্বামী ছিলেন কেন্‌টাকির এক খনি শ্রমিক। চমৎকার কিছু গান বেঁধেছিলেন তিনি, যেগুলো আমি আজও মাঝে মাঝে গাই :

"I am a union women
As brave as I can be
I do not like the bosses
And the bosses don't like me.
Join the CIO boys
Join the CIO."

হার্ভার্ড কলেজ থেকে সরে পড়ার আগেই আমি এই ধরনের কিছু কিছু গান শিখে ফেলি। আর দু'বছর পর আমি যখন সাংবাদিক হবার চিন্তাটা ত্যাগ করলাম, তখন আমি এইসব গান গাইতে শুরু করলাম লোকের সামনে।

সুমন : সেটা কি তিরিশ দশকের শেষদিকে?

পীট সিগার : হ্যাঁ, তিরিশের শেষদিকে। যত দূর মনে পড়ে, হার্ভার্ড থেকে বেরিয়ে যাবার এক বছর পর আমি বুঝতে পারলাম যে খবরের কাগজে চাকরি আমি পাবো না। তখন আমি ইস্কুলে ইস্কুলে গান গেয়ে বেড়াতে লাগলাম। ১৯৩৯ সালের গ্রীষ্মে আরো তিনজনের সঙ্গে আমি বেরিয়ে পড়লাম ধর্মঘটী গয়লাদের জন্য গান গাইতে। তাঁদের একটা ইউনিয়ন ছিল নিউইয়র্ক রাজ্যে। আমরা তখন শহরে শহরে পুতুলনাচ দেখিয়ে বেড়াচ্ছি। আমি করতাম গরুর পার্ট। গরুর মতো করে কথা বলতেও শিখেছিলাম আমি (পীট সিগার এই কথাটা বললেন গরুর মতো আওয়াজ করে)। নাটকে ছিলো : একটা গরু গয়লা আর খামার শ্রমিকদের বলছে অন্যান্য খামার শ্রমিকদের সঙ্গে একজোট হয়ে কিভাবে তাঁদের দুধের জন্য আরো বেশি দর হাঁকতে হবে। পুতুলনাচের ফাঁকে ফাঁকে আমি মঞ্চের সামনে দাঁড়িয়ে গান গাইতাম মাঝে মাঝে। তার কতগুলো ছিল পুরোনো গান। একটা গান ছিল ১৮৮০ সালের :

"Oh the farmer is the man
The farmer is the man
Lives on credit till the fall
With the interest rate so high
It's a wonder he don't die
Cause the middleman's the one that gets it all."

একশো বছর আগে খামারজীবীদের যে আন্দোলন হয়েছিল এ হল তারই গান। এ গান গেয়েছি পঁয়তাল্লিশ বছর আগে। বাবার কাছে থেকে শিখেছিলাম গানটা। গবেষণা করতে গিয়ে এই গানটার সন্ধান পেয়েছিলেন তিনি। কয়েকটি নতুন গানও বেঁধেছিলাম আমি। বেশিরভাগই করতাম কি, গানের কথাগুলো পাল্টে দিতাম। দক্ষিণের তুলো চাষীদের একটা গান ছিলো :

"Seven cent cotton and forty cent meat
How in the world can a poor man eat."

কয়েকটা শব্দ পাল্টে দেওয়ায় গানটা দাঁড়ালো :

"One dollar milk and forty cent meat
How in the world can a poor man eat."

১৯৩৯ সালের গ্রীষ্মে এই গানটা আমি গাইলাম খামারজীবী আর শ্রমিকদের সঙ্গে।

সুমন : এরকম কি বলা যায় যে আপনার গায়কজীবন এগিয়েছে এ-দেশের রাজনৈতিক আন্দোলনগুলোর হাত ধরে?

পীট সিগার : কয়েকটার ক্ষেত্রে তো বটেই। দেখুন, বিভিন্ন ধরনের কিছু রাজনৈতিক আন্দোলনের সঙ্গে আমার আরো ভালো পরিচয় হয়েছে বেশ সম্প্রতি। তিরিশের দশকে লড়াইটা ছিল ফ্যাসিবাদের বিরুদ্ধে। দ্বিতীয় বিশ্বযুদ্ধের পর সংগ্রাম ছিল শান্তির জন্য। পঞ্চাশের দশকে লড়াই ম্যাকার্থিবাদের বিরুদ্ধে। ষাটের দশকে চলেছে নাগরিক অধিকার আন্দোলন। ষাটের শেষের দিকে আর সত্তরের গোড়ায় চলেছে ভিয়েতনাম যুদ্ধের বিরুদ্ধে লড়াই। বিষিয়ে ওঠা প্রাকৃতিক পরিবেশটাকে বাঁচানোর জন্যেও লড়াই চলছে। এই যে এত ধরনের লড়াই, এগুলো কিন্তু আসলে একটা বিরাট সংগ্রামের বিভিন্ন অংশ। আমার ধারণা, আজ থেকে পাঁচশো বছর পর মানুষ নামে কোনো জাতির অস্তিত্ব যদি থাকে তো তখন এই বিরাট সংগ্রামের একটা নামও দেওয়া হবে। ঠিক যেমন ইউরোপের রেনেসাঁসের নাম দেওয়া হয়েছে। ঐ একটিমাত্র নাম কতকিছু বোঝায়। আলাদা আলাদা নাম তো আর দেওয়া হয়নি। কেউ যেমন বলে না বড়ো বড়ো জাহাজ বানিয়ে সাতসমুদ্র পাড়ি দেবার রেনেসাঁস, স্থাপত্যের রেনেসাঁস, কাব্যের রেনেসাঁস, শিল্পের রেনেসাঁস। এইরকম আলাদা আলাদা নাম তো আর দেওয়া হয়নি। ইতিহাসের একটা গোটা অধ্যায়কে বলা হয়ে থাকে রেনেসাঁস। এবং ইতিহাসের যে অধ্যায়ে আমরা রয়েছি, এরও একটা নাম দেওয়া হবে। আমাদের যুগের একটা নাম এর মধ্যে কেউ ভেবে রেখেছে বলে আমার মনে হয় না অবশ্য।

সুমন : আপনি যখন গান লেখেন তখন কী থেকে আপনি প্রেরণা পান? আপনার গান লেখার প্রক্রিয়াটা কেমন?

পীট সিগার : মাঝে মাঝে আমার মাথায় একটা আইডিয়া আসে। আমি চেষ্টা করি সেই আইডিয়াটা ফুটিয়ে তোলার জন্য এটা গল্প খুঁজে বের করতে। তবে আমায় স্বীকার করতেই হবে যে, এ কাজে আমি সফল হই খুব কম। অনেকবার আমি চেষ্টা করেছি, সমানে চেষ্টা করে গেছি এমন একটা গান বাঁধতে যার মধ্য দিয়ে একটা বিশেষ আইডিয়া প্রকাশ পাবে। এবং আমি ব্যর্থ হয়েছি। তবে সাধারণত দেখেছি, মুহূর্তের প্রেরণায় যে গান বেঁধেছি সেটাই গান হিসেবে বেশ দাঁড়িয়ে গেছে। এই তাগিদটা মাঝে মাঝে আসে আধা-ঘুমন্ত আধ-জাগা অবস্থায়। এইরকম অবস্থায় আমি হয়তো একটা লাইন পেয়ে গেলাম। চকিতে গানের একটা কলি এসে গেল। ১৯৬৭ সালের কোনো এক সময়ে এরকম হয়েছিল একবার। কথা আর সুর একই সঙ্গে এসে গিয়েছিল।

সুমন : বেশিরভাগ সময়ে কি এরকমই হয় যে কথা আর সুর একই সঙ্গে এল?

পীট সিগার : হ্যাঁ। তবে অনেক সময়ে আমার মাথায় একটা সুন্দর সুর আসে, তারপর আমায় খাটতে হয়। ঐ সুরের উপযুক্ত কথা বের করতে। কথার চেয়ে সুর অনেক সহজে আসে আমার মনে। কখনো আবার প্রচলিত সুরে নতুন কথাও বসিয়েছি। ১৯৭৩ সালে আমি একটা গান লিখেছিলাম। এবং গান-লেখা, আমার গান-লেখার সেটাই বোধহয় শ্রেষ্ঠ নিদর্শন। সনাতন একটা নিগ্রো স্পিরিচ্যুয়ালকে পাল্টানোর জন্য আমি তিনটি শব্দ খুঁজে বেড়াচ্ছিলাম। শেষ লাইনটা আমার কিছুতেই মনে ধরছিল না। আমার মনে হচ্ছিল শেষ লাইনটা আরো ভালো হতে পারে। অন্যরাও বলছিল। অনেকেই চেষ্টা করেছে শেষ লাইনটা পাল্টাতে, আরো ভালো একটা লাইন বসাতে। অনেক ভেবে, বিস্তর মাথা খাটিয়ে শেষে আমি তিনটি উপযুক্ত শব্দ পেয়ে গেলাম। চমৎকার মানিয়ে গেল। এখন ঐ গানটা কত লোকে গায়।

সুমন : কোন গানটা?

পীট সিগার : "উই আর ক্লাইমবিং জেকব্‌স ল্যাডার"। বাইবেলের একটা লাইনের উল্লেখ আছে এতে : একটা সিঁড়ি উঠে যাচ্ছে স্বর্গের দিকে। সিঁড়িটায় অনেকগুলো ধাপ। দ্বিতীয় স্তবকে বলা হয়েছে : প্রতিটি ধাপ উঠে যাচ্ছে আরো ওপরে। একই কথা অনেকবার বলা হয়েছে গানটায়। শেষ লাইনটা হল, "ব্রাদারস সিস্‌টারস্‌ অল।"—ব্যাস। লাইনটা এত সরল যে আমার হাসি পেয়ে গিয়েছিল। আরো কত জটিল, কত শক্ত শক্ত কথা যে ভেবেছি আগে। দশ বছর লেগে গেছে এই একটা লাইন লিখতে। ঠিক লাইনটা ভেবে বের করতে।

সুমন : পুঁজিবাদী দুনিয়ার সংগীত ইন্ডাস্ট্রি সম্পর্কে আপনার কী মত? সংগীত সৃষ্টি, উৎপাদন, কেনাবেচা ইত্যাদির পুঁজিবাদী প্রথা সম্পর্কে?

পীট সিগার : মাঝে মাঝে আমি খুব হতাশ হয়ে পড়ি সংগীত ইন্ডাস্ট্রির হালচাল দেখে। মাঝে মাঝে আবার, এই একই যন্ত্রের মধ্য দিয়ে কি চমৎকার সংগীত বেরিয়ে আসছে দেখে অবাক হয়ে যাই। টাকা হল এমনই এক বস্তু যা যে-কোনো জিনিসকে বিকৃত করে তুলতে পারে। পুরাণের রাজা মাইডাস যা ছুঁতেন সেটা অমনি সোনা হয়ে যেত। মাঝে মাঝে আমার মনে হয়, পুঁজিবাদী সংগীত বাজার যা ছোঁয় সেটা আবর্জনায় পরিণত হয়। মনে হয়, বহু ভালো জিনিসকে নষ্ট করার ক্ষমতা এই বাজারের আছে। লোকের জীবনও নষ্ট হয়ে যায় এই বাজারের দৌলতে। আমি এমন অনেককে জানি যাঁরা চমৎকার সংগীতশিল্পী হিসেবে জীবন শুরু করেছিলেন। কিন্তু কালক্রমে তাঁরা দ্বিতীয় শ্রেণীর শিল্পীতে পরিণত হন। এটা সংগীত ব্যবসারই কাজ।

কেউ যে গান শোনায় না, তা নয়। তবে সংখ্যায় তারা বড়ই কম। আজকাল কত সহজেই লোকে একটা রেকর্ড বা টেপ মেশিন বা ধরুন টেলিভিশন চালিয়ে দেয়। আমার তো মনে হয়, আমাদের জীবনে একটা মস্ত অভাব থেকে যাচ্ছে।

সুমন : আপনি তো নিশ্চয় সমাজবাদী দেশগুলো ঘুরে দেখেছেন, তাই না?

পীট সিগার : যতগুলো পেরেছি ঘুরেছি। সোভিয়েত ইউনিয়ন, চীন, ভিয়েতনাম, কিউবা। আমার এক মেয়ে ও নাতি আজ নিকারাগুয়ায় থাকে। সমাজবাদী দেশগুলোর সাফল্য আর ব্যর্থতা দুটোই দেখেছি আমি। ইলিয়া এরেনবুর্গ একবার একটা কথা বলেছিলেন। আমি সেটা প্রায়ই আউড়ে থাকি। ১৯৫৭ সালে নেরুদার সঙ্গে দেখা করতে তিনি চিলি যাচ্ছেন। তখন তিনি আর্জেন্টিনায়। আর্জেন্টিনার এক কাগজের রিপোর্টার তাঁকে বললেন : "মিস্টার এরেনবুর্গ, স্তালিনের জমানায় যে-সব ভয়ানক ব্যাপার হয়ে গেছে সেগুলো সম্পর্কে আপনার মন্তব্য কী?"— এরেনবুর্গ বললেন : "আমরা বুঝতে পেরেছি যে, পুঁজিপতিদের হাত থেকে রেহাই যদি পেলাম ঐ মহামূর্খের হাত থেকে রেহাই পেতে গিয়ে তো প্রাণ ওষ্ঠাগত।"— আমার মনে হয়, সব বিপ্লবীর উচিত কথাটা চিন্তা করে দেখা। "উই আর ক্লাইমবিং জেকব্‌স ল্যাডার" গানটা গাইতে যে আমার এত ভালো লাগে তার একটা কারণ হল, সত্যিকার বৈপ্লবিক ঐতিহ্যটা অনেকদিনের এবং তাতে অনেকগুলো ধাপ আছে। আমি মনে করি না যে দুম করে স্বর্গ নেমে আসবে আমাদের হাতে। অনেকগুলো সিঁড়ি পার হতে হবে আমাদের। কয়েকটা ধাপ বড়, কয়েকটা আবার ছোট।

সুমন : আপনার কি মনে হয় সমাজবাদী দেশগুলো এমন সংগীত তৈরি করতে পেরেছে যেটা কিনা জনগণের সত্যিকার জীবনের আরো কাছে?

পীট সিগার : কয়েকটা জায়গা হ্যাঁ, কয়েকটা ক্ষেত্রে না। নিশ্চিতভাবে কোনো কিছু জানতে গেলে একটা জায়গায় যতদিন থাকা উচিত, ততদিন কোথাওই থাকিনি আমি। আমার ধারণা, আঙ্গিকসর্বস্ব হয়ে পড়ার একটা ভয় থেকে গেছে। শিল্পে আঙ্গিকসর্বস্বতা হল রাজনীতিতে একগুঁয়ে, বদ্ধমূল ধারণার মতো। কয়েকটা শব্দ আঁকড়ে ধরে আপনি মনে করে বসলেন যে এই শব্দগুলোই ঠিক কথাগুলো বলে দিচ্ছে এবং জনগণকেও আপনি বলে দিলেন এই শব্দগুলোই আউড়ে যেতে। কিন্তু মুশকিল হল যে একটা শব্দ কখনো সত্য হতে পারে না। তা হলো সত্যের একটা

সুমন : আপনার নিজের ক্ষেত্রে কী ঘটেছে জানতে ইচ্ছে করে। সাংবাদিক হবার চিন্তা ছেড়ে পেশাদার সংগীতশিল্পী হবার পর গান গেয়ে পাওয়া টাকায় কি আপনার কুলোতো?

পীট সিগার : দেখুন, পঞ্চাশের দশকটা তো ছিল ত্রাসের দশক,— সে সময়ে সাধারণ কনসার্ট হল বা কলেজে আমার ডাক পড়ত না। অর্থাৎ তথাকথিত অর্থে ভালো ভালো জায়গায়, কেষ্টবিষ্টু ভদ্রলোকদের জায়গায় আমি গাইতে পারতাম না। তবু, সেই ঝকমারির দশকেও আমি বেঁচে থাকার মতো টাকা কামাতে পেরেছি গান গেয়ে। এখানে ওখানে শ'খানেক লোকের সামনে গাইলাম। তারপর সেই শ'খানেক হয়ে দাঁড়াল শ'পাঁচেক। কালক্রমে হাজারখানেক। ষাটের দশক যখন এল আমি তখন আমার ছেলেমেয়েদের নিয়ে বেড়াতে যেতেও পেরেছি। আমার বাচ্চাদের কখনো উপোস করতে হয়নি। পাওনাদারদের টাকাও মেটাতে পেরেছি নিয়মিত। এদিক দিয়ে আমি ভাগ্যবান।

সুমন : ছেলেমেয়েদের গান গাওয়ার কথাটা তুললেনই যখন, তখন আপনার কাছ থেকে একটা কথা জানতে চাই। আমাদের দেশে বিশেষ করে শহর এলাকায় ছেলেমেয়েদের, বিশেষ করে মেয়েদের গানের ইস্কুলে পাঠানোর একটা রেওয়াজ বেশ চালু। কোনো কোনো ক্ষেত্রে এটা বেশ ফ্যাশনের মতো। এদেশেও কি এটা ঘটে?

পীট সিগার : মধ্যবিত্তরা তাদের ছেলেমেয়েদের পাঠায় বটে গানের ইস্কুলে। আর সাধারণত ছেলেমেয়েরা সেটা মোটেই পছন্দ করে না। সত্যি বলতে ছেলেমেয়েদের সংগীত সম্পর্কে বিরূপ করে তোলার এ এক মোক্ষম পন্থা। সব সময়ে অবশ্য নয়। সাবেককালে, মানুষ যখন পল্লীবাসী ছিল, সংগীত ছিল জীবনের অনানুষ্ঠানিক এক অঙ্গ। এখন আর তা সেরকম নয়। অল্প কিছু লোকের বেলা ব্যাপারটা অবশ্য অন্যরকম এখনো — এবং তাদের হয়তো বিলকুল নগণ্য বলাটা ঠিক হবে না। শুনেছি ১ কোটি ৮০ লক্ষ লোক আজ আমেরিকায় গিটার বাজায়। এটা আমেরিকার মোট জনসংখ্যার শতকরা ৭ ভাগ মতো। এরা হয়তো মাঝে মধ্যে নিজেদের বাড়ির লোকজনদের জন্যেও গিটার বাজায়। কিন্তু এককালে প্রায় প্রত্যেক মা তাঁর ছেলেমেয়েদের ঘুম পাড়াতেন গান গেয়ে। প্রায়ই দেখা যেত বাপও ছেলেমেয়েদের গান শোনাচ্ছে। এ ধরনের মানুষ কিন্তু আজ ব্যতিক্রম। আজ রাতে আমার নাতিকে আমি গান শোনাচ্ছিলাম। শোনাতে শোনাতে আমার মনে হচ্ছিল যে এই কাজটা করার মতো ঠাকুর্দা-ঠাকুমা আজ আর তেমন নেই। আমার মন খারাপ লাগছিল। কেউ

প্রতীক মাত্র। এবং দু'জন লোক কখনো একই শব্দে একই অর্থ আরোপ করবে না। শেষবেশ দেখা যায় কী? — না, লোকে হাস্যকর সব ভুল করে বসছে। তাছাড়া আমি এও মনে করি যে, ঠিক যেমন বিভিন্ন ধরনের পুঁজিবাদ আছে, তেমনি সমাজবাদও আছে বিভিন্ন ধরনের। এবং আমরা হয়তো পরস্পরের কাছ থেকে কিছু শিখতেও পারি।

সুমন : মার্কিন যুক্তরাষ্ট্রে র‍্যাডিকাল কবি, লেখক ও রাজনৈতিক কর্মী আছেন। র‍্যাডিকাল সংগীতকার ও কণ্ঠশিল্পীও কি আছেন এদেশে? আপনি কি নিজেকে তাঁদের একজন বলে মনে করেন?

পীট সিগার : হ্যাঁ, যদি "র‍্যাডিকাল" কাকে বলে তার একটা সংজ্ঞা দেওয়া যায়।

সুমন : আপনি নিজে কিরকম সংজ্ঞা দিতে চান?

পীট সিগার : র‍্যাডিকাল হলো সেই লোক যে মুহূর্তের জন্য স্বস্তি দিতে পারে এমন সহজ-সরল সংস্কারের চেয়ে বেশি কিছু চায়। আমি সত্যিই মনে করি, মানবজাতির অস্তিত্ব কিছুতেই থাকবে না, যদি না আমরা খুব বড় কিছু পরিবর্তন ঘটাই — যেগুলোকে বেশিরভাগ লোক র‍্যাডিকাল পরিবর্তন বলবে। কিভাবে আমরা এইসব পরিবর্তন ঘটাব, তা আমি স্থির জানি না। আমার মনে হয় না "সারমন্ অন্ দ্য মাউন্ট" এর যে বাণী সেটা শিখে নেবার জন্য আমরা আরো দু'হাজার বছর সময় পাব। ব্যক্তিগত ফায়দা, মুনাফার তাগিদটাকে কিভাবে নিয়ন্ত্রণ করা যায় সেটা শেখার জন্য আমরা এমনকি আর শ'খানেক বছর পাব কিনা সন্দেহ। ব্যক্তিগত মুনাফার তাগিদ চমৎকার সব জিনিস তৈরি করতে পারে। তবে সেটাকে একটা সীমার মধ্যে রাখতে হবে। কারণ, আজ আমরা ধ্বংসের মুখোমুখি। আমরা হয়তো নিজেদের তৈরি বিষে নিজেরাই উধাও হয়ে যাব পৃথিবীর বুক থেকে। নিজেদের ওপর বোমা ফেলার চেয়ে হয়তো ঐ সম্ভাবনাটাই বেশি। হয়তো আমরা পরমাণু শক্তির দৈত্যটাকে আবার ঢুকিয়ে দিতে পারব বোতলের ভেতর। আমরা ধারণা, সামনের দশ কি বিশ বছরের মধ্যে এরকম জোর সম্ভাবনা আছে যে গোটা মানবজাতি বলবে : "আর বাপু পরমাণু — শক্তিতে কাজ নেই। এটা বড্ড বিপজ্জনক। দুর্ঘটনা ঘটে গেছে। বহু। এবং অনেকবার আমরা অল্পের জন্য বেঁচে গেছি।"— কিন্তু যে লক্ষ লক্ষ টন মারাত্মক বিষাক্ত জিনিস, রাসায়নিক পদার্থ লক্ষ লক্ষ জায়গায় মজুত রয়েছে সেগুলোর কী হবে? আর, এইসব জিনিস ব্যবহার করা যত সহজ, এবং তাতে করে কত মুনাফা হয় — ব্যক্তিমানুষের এবং কর্পোরেশনগুলোর।

সুমন : পীট, আপনি তো ১৯৬৩ সালে ভারতে গিয়েছিলেন। ভারতের বিভিন্ন ধরনের গানের সঙ্গে কি আপনি পরিচিত?

পীট সিগার : কিছু কিছু শুনেছি। এবং বুঝেছি যে ভারত, আফ্রিকা ও সম্ভবত ইন্দোনেশিয়ায় পৃথিবীর কিছু শ্রেষ্ঠ সংগীতের সন্ধান পাওয়া যায়। ভারত ও আফ্রিকায় সংগীত তো অনবদ্য বটেই, তাছাড়া শুনেছি সেখানকার কবিতাও অসাধারণ। হয়তো এই কারণেই পাশ্চাত্য সংগীত অন্য কয়েকটা দেশে, যেমন জাপানে যে প্রভাব ফেলতে পেরেছে, ভারত ও আফ্রিকায় তা পারেনি। পাশ্চাত্য সংগীত জাপানের প্রাচীন ঐতিহ্যকে একেবারে ডুবিয়ে দিয়েছে। প্রাচীন ঐতিহ্য তাই বলে লোপ পায়নি, তবে কোণঠাসা হয়ে পড়েছে বৈকি।

সুমন : ভারতের কোনো সংগীতশিল্পী বা কোনো গীতিকারের সঙ্গে আপনার পরিচয় আছে কি?

পীট সিগার : কয়েকজনের সঙ্গে আলাপ হয়েছিল। কিন্তু ভালো করে পরিচয় নেই। ভারতে গিয়েছিলাম যখন, তখন কয়েকজনের সঙ্গে আলাপ হয়েছিল।

সুমন : আপনি তো গানও গেয়েছিলেন সে সময়ে।

পীট সিগার : কলকাতার ময়দানে দশ বিশ হাজার লোকের সামনে গান গেয়েছিলাম আমি। তারপর নতুন দিল্লি গেলাম। সেখানেও কয়েকটা ছোট অনুষ্ঠানে গেয়েছিলাম — অত লোক অবশ্য ছিল না। রবীন্দ্রনাথ ঠাকুর যেখানে থাকতেন, তার কাছাকাছি একটা গ্রামেও গিয়েছিলাম আমরা। — একটা ব্যাপার আমি কিন্তু একবার নয়, চার-পাঁচবার শুনেছি। একটা বক্তব্য যেটা বারবার শুনতে হয়েছে গানে, এবং যার সঙ্গে আমি একমত নই। কতকটা এইরকম : হে প্রভু, আমি একটা ছোট্ট প্রদীপ মাত্র, ভেসে চলেছি কাগজের একটা ছোট নৌকোয়। আমাকে ঐ পারে নিয়ে যাও। কিছুই করার ক্ষমতা নেই আমার। তোমারই ওপর ভরসা করে বসে আছি।

সুমন : কোথায় শুনেছিলেন এটা?

পীট সিগার : মনে হচ্ছিল একের পর এক গানে শুনেছি।

সুমন : কী গান মনে পড়ে?

পীট সিগার : ভক্তিগীতি। অপূর্ব ছন্দ, অনবদ্য সুর। কিন্তু আমায় বলতেই হবে যে তার দর্শনের সঙ্গে আমার মতের মিল নেই। আমার নিজের যে ঐতিহ্য সেটা জোরালো : যে স্বাবলম্বী, ঈশ্বর তাঁকেই সাহায্য করেন। আমার কৃষ্টি এও বলে যে, ঈশ্বর আমাদের বুদ্ধি দিয়েছেন সেটা খাটানোর জন্য, পেশী দিয়েছেন তা দিয়ে কাজ করার জন্য। এবং আমি

মাও সে তুঙের সঙ্গে একমত যখন তিনি বলেন : "ছাদের ঝুল জমলে একটা লম্বা ঝাড়ু দিয়ে সেটাকে মেহনত করে সাফ করতে হবে।" — ঐ বস্তুটি আপনা-আপনি খসে পড়বে না নিচে।

সুমন : ভারতে গিয়ে অথবা ভারতে যাবার আগে বা পরে আপনি কি ভারতের আধুনিক গান কিছু শোনার সুযোগ পেয়েছেন? বিশেষ করে বাংলা গান?

পীট সিগার : কিছু শুনেছি বৈকি। মজার কথা হল ভারতে থাকাকালে তত শুনিনি যতটা শুনেছি এখানে। ভারতীয় গণনাট্য সঙ্ঘের গান, কিছু রেকর্ড থেকে। সেই পঞ্চাশের দশকে। তিরিশ বছর হয়ে গেল। তিরিশ বছরেরও বেশি। একটা গান আমরা আমাদের ছোট্ট গানের কাগজেও ছেপেছিলাম। গানটা ইংরিজিতে লেখা। নাম : দইওলা। গায়কের বয়স আমার চেয়ে সামান্য বেশি। এখনো বেঁচে আছেন কিনা জানি না। যতদূর মনে পড়ে তাঁর নাম ছিল হারিন চ্যাটার্জি। চমৎকার একটা লাইন লিখেছিলেন তিনি :

"I think the God above would cease to be a fool
I think the God above would cease to feel a fool
If every church would become a hospital, a school."

এই কথাগুলো আজ ভেবে দেখলে আমার মনে হয় একই শব্দ দু'জন লোকের কাছে দু'রকমের অর্থ বয়ে আনতে পারে। আমি বলব, ইস্কুল হতে পারে গির্জা, আর হাসপাতাল হতে পারে ইস্কুল। আমার এক বন্ধুর লেখা গান আছে। হাড্‌সন নদীর ধারে হাঁটতে হাঁটতে গাই আমি সেই গান। গানটা অর্ধেক স্প্যানিশ অর্ধেক ইংরিজি। গোটা গানটা ইংরিজিতে অনুবাদ করলে দাঁড়াবে এইরকম।

"We are the boat, we are the sea
I sailing you, you sailing me.
The stream sings into the river
The river sings into the sea
The sea sings into the boat
That carries you and me."

সব কিছু পরস্পরের সঙ্গে জড়ানো। এর ওপর ওর প্রভাব পড়ে। আমি মনে করি, পৃথিবীকে এটাই শেখাতে পারেন কবিরা।

সুমন : এখন আপনি কী করছেন জানতে ইচ্ছে করে। নতুন গান বাঁধছেন নাকি?

পীট সিগার : ভেসে থাকতে চেষ্টা করছি কোনোরকমে। তাড়াতাড়া চিঠি আসে রোজ। "ডিক্টেটর" হয়ে গেছি। মুখে মুখে জবাব দিয়ে যাই।

একজন সেক্রেটারি সেগুলো টাইপ করে নেন। হাড্‌সন নদীটাকে পরিষ্কার রাখার একটা উদ্যোগে আমি আছি। আমার বাড়ির কাছেই একজন বিজ্ঞানী থাকতেন। তাঁর একটা শ্লোগান ছিল যেটা, আমি মনে করি, সারা দুনিয়ার শ্লোগান হওয়া উচিত : "গোটা পৃথিবীর কথা চিন্তা করে স্থানীয় ভিত্তিতে কাজ করো।"— তাঁর নাম ছিল রেনে দুবোয়া। জন্ম ফ্রান্সে, কিন্তু খাসা ইংরিজি লিখতেন। জীববিজ্ঞানে নোবেল পুরস্কার পেয়েছিলেন। কাছেই থাকতেন। মারা গেলেন ৮০ বছর বয়সে। একবার পরিচয় হয়েছিল। দিলদরিয়া, দয়ালু লোক ছিলেন। তাঁর কোনো বিজ্ঞানী বন্ধুর মতো তিনি কিছুতেই নিরাশাকে প্রশ্রয় দিতেন না।

সুমন : ৬৫ বছর বয়েসেও আপনি আসলে তরুণ। এবারে বলুন ভবিষ্যতে কী করবেন বলে ভাবছেন।

পীট সিগার : সহজভাবে, স্মিত হেসে অবসর নেওয়া যায় কিভাবে, সেটা শিখতে চাই। এই "কিভাবে"টা একটা বড় প্রশ্ন। এর উত্তর ঠিক জানা নেই। ইদানিং হয়েছে কি, কানে খাটো হয়ে পড়েছি। মাঝে মধ্যে হিয়ারিং এইড লাগাতে হয়। হয়তো গলা বা পায়ের জন্যে নয়, আমার কানের জন্যই হয়তো অবসর নিতে হবে। তবে হ্যাঁ, চশমা পরার ক্ষমতা যতদিন থাকে, ততদিন আমি লেখাপড়া চালিয়ে যেতে চাই।

সুমন : এক জায়গায় আপনি আমায় বলেছেন যে, আপনার প্রথম যৌবনে উডি গাথ্‌রির উপস্থিতি আপনাকে প্রেরণা দিয়েছিল। আপনার কি মনে হয় যে আপনি নিজেও কাউকে প্রেরণা দিতে পেরেছেন, জাগিয়ে তুলতে পেরেছেন আপনার জীবনে?

পীট সিগার : এ সম্পর্কে আমার বিন্দুমাত্র ধারণা নেই। লোকে আমায় বলেছে যে, তারা আমার রেকর্ড শুনে, আমার অনুষ্ঠানে এসে কিছু কিছু আইডিয়া পেয়েছে। কিন্তু নিশ্চিতভাবে কিছু বলার জো নেই আমার।

সুমন : আপনার যে শিল্প তার তালিম দিয়েছেন কি কখনো কাউকে?

পীট সিগার : শেখানো ব্যাপারটা আমার ভালো আসে না। কয়েকবার ব্যাঞ্জো বাজানোর ওপর কিছু পাঠ দিয়েছি। একটা বইও লিখেছি ব্যাঞ্জোর ওপর। কেউ কেউ বলেছে যে, ঐ বই পড়ে কিছু শিখেছে তারা। এই পর্যন্তই। এর বেশি কিছু আমি জানি না।

রবীন্দ্রনাথকে

শ্রীচরণেষু,

এই প্রথম আপনাকে লিখছি। আরও অনেকের মতো আমিও আপনার চিঠি পেয়ে আসছি জন্মাবধি। আমি জানি, 'জন্মাবধি' কথাটাকে আপনি আক্ষরিক অর্থে নেবেন না। বলা উচিত ছিল 'জ্ঞান হবার পর থেকে।' কিন্তু তাতেও যে গোল বাঁধতে পারে। আপনি হয়তো পরিহাস ক'রে ব'লে বসবেন —'জ্ঞান তোমার আজও হয়েছে কি?'

আমি বিপদে প'ড়ে যাব। গেছিও। না, আজও হয়নি বোধহয়।

তাহলে? আচ্ছা বেশ, এইভাবে বলা যাক : সেই কোন ছোটবেলা থেকে আমিও আপনার চিঠি পেয়ে আসছি।

আমার বাবা-মা পৌঁছে দিতেন চিঠিগুলো। আমি তখন খুব ছোট্ট। কটকের বাসায় সন্ধেবেলা হারমোনিয়ম বাজিয়ে আমার বাবা আপনারই গান গাইছেন। মা গাইছেন তাঁর সঙ্গে। আমি হাঁ ক'রে শুনছি।

সংসারের টুকিটাকি কাজ করতে করতে মা আপনমনে গেয়ে উঠছেন আপনারই গান।

আপনার চিঠিগুলো এইভাবে পৌঁছে গিয়েছে আমার কাছে।

বুড়ো বয়স পর্যন্ত বাবা তো আপনাকে নিয়েই কাটিয়ে দিলেন। অবশ্য সেই তরুণ-বৃদ্ধের অবসরের সবটুকু আপনি একা দখল ক'রে রাখতে পারেননি। আমীর খান, বেগম আখতার, রবিশঙ্কর, নিখিল বন্দ্যোপাধ্যায়, বিসমিল্লা খান, ভীষ্মদেব চট্টোপাধ্যায়, দিলীপ কুমার রায়, জ্ঞানপ্রকাশ ঘোষ, সলিল চৌধুরী, নচিকেতা ঘোষ, হেমন্ত মুখোপাধ্যায়, সতীনাথ মুখোপাধ্যায়, পান্নালাল ভট্টাচার্য, গোলাম আলির গজল, বড়ে গোলাম আলির ঠুংরি, মেহেদি হাসান থেকে নিয়ে মোৎসার্ট, বেঠোফেন, বীট্‌ল্‌স, এলভিস্ প্রিস্‌লির 'গেটো', বব ডিলান, বীরেন চট্টোপাধ্যায়ের কবিতায় বিনয় চক্রবর্তীর সুর 'তোর কি কোনো তুলনা হয়'— কত কী যে আমার প্রথম সংগীত গুরুকে বৃদ্ধ বয়স পর্যন্ত ঘিরে থাকত।

আপনি তো সব জানেন। কেন জানি না আমার মনে হয় যে আপনি সব জানেন, সব দেখতে পান। আমার ধারণা, আপনি দেখে নিয়েছেন — বাবা কেমন ক'রে একবার পঙ্কজ কুমার মল্লিকের গাওয়া আপনার একটি গান এবং তার পরেই পল রোবসনের গাওয়া একখানি ইংরিজি গান বাজিয়ে বাজিয়ে শুনছেন। একা। সঙ্গে এক পাত্র রাম্ আর একটা আধপোড়া চুরুট। সেই আধপোড়া চুরুট বা চারমিনার টানতে টানতে

প্রবীণ মানুষটি আনমনা হয়ে 'ঘরেতে ভ্রমর এলো গুনগুনিয়ে' গাইছেন খালি গলায়। আপনি তো শুনে নিয়েছেন সবই।

এই প্রবীণ মানুষটি যখন নবীন ছিলেন, আপনি তাঁকে শান্তিনিকেতনে রেখে গান শেখাতে চেয়েছিলেন। মানুষটির কাছে শুনেছি, বুলা মহালনবীশ এসে তাগাদা দিচ্ছিলেন —"ওহে, কবি তোমায় ডেকেছেন যে! বলেছেন — দেখো বাপু, কবিতা-টবিতা লেখে না তো ছোকরা? তাহ'লে কিন্তু শেখাব না।"

পঁচিশ টাকা বৃত্তির ব্যবস্থা হয়েছিল। কিন্তু সেই নবীনের ওপর তখন সংসারের অনেক বোঝা। আরও বেশি টাকা দরকার। নবীনটি তাই ভাতডাল-হাঁড়িখুন্তি-কাপড়চোপড়ের দায়ে টেক্সটাইল ইন্‌স্‌পেক্টরের চাকরি নিয়েছিলেন। আশি টাকা মাইনে।

শ্রীচরণেষু, খোদ আপনার পায়ের কাছে ব'সে গান শেখার সুযোগ আর কলকাতা শহরে বাসা ভাড়া ক'রে গুটি চার-পাঁচ পেট ভরানোর বাধ্যবাধকতার মধ্যে ফারাকটা ছিল তখন (৮০-২৫) পঞ্চান্ন টাকা।

সংসারের হিসেবটা কেমন যেন। তাই না? আপনি তো সব জানেন।

আপনার আমলের সেই 'ছোকরা' যখন একদিন প্রবীণ হলেন, তাঁর ছোটপুত্র তখন তাঁকে বলেছিল —

তুমি কী বোকা! তখন যদি তুমি গান শিখতে যেতে ওঁর কাছে, তোমার জীবনটা কেমন হত ভাবো!

আর আমি কতটা বোকা ভাবুন আমি আবার লিখছি এসব কথা। সেরকম লোক এ-চিঠিটা প'ড়ে ফেললে কাগজপত্রে, শিবিরে শিবিরে কী তুলকালাম কাণ্ডটাই না হতে পারে। কত ভালো ভালো 'শিক্ষিত' লোক, — না না, আপনার পদ্যে কুমোর পাড়ার গরুরগাড়ি যিনি চালান, সেই বংশী-বদন নন,— দস্তুরমতো 'শিক্ষিত' লোকরা আমার বাবাকেও মিথ্যুক টিথ্যুক কত কী বলতে শুরু করবেন। লেখালিখিও করতে পারেন তাঁরা।

তাহ'লে লিখছি কেন? আপনি জানেন না বুঝি? অনেকেই আপনার এই মহা-অযোগ্য ভক্তর নামের সঙ্গে 'বিতর্কিত' বিশেষণটি জুড়ে দিয়েছেন। আরও 'বিতর্ক' উস্কে দেবার জন্য লিখছি এসব। ইস্, বুলা মহালনবীশের কথাগুলো আর বাবার কথাগুলো যদি টেপ রেকর্ড করা থাকত? অথবা আপনার লেখা একটি চিঠি?

টেপ রেকর্ডার যন্ত্রটা প্রথম দেখেছিলাম আপনারই শান্তিনিকেতনে। তখন আমি খুব ছোট। বাবাকে যেতে হয়েছিল আকাশবাণীর কাজে। আমার ভালো মনে নেই অনেক কিছু। মনে আছে শুধু — একটা মস্ত বড় গাছের তলায় গান হচ্ছে। অনেকে চুপচাপ ব'সে শুনছিলেন। আমিও

ছিলাম একপাশে। কারুর কারুর গান একদম ভালো লাগছিল না, কিন্তু পরিবেশটা ভালো লাগছিল খুব।

তারপর একজন গাইতে বসলেন। প্রথম গানটি ধ'রেই একদম দখল ক'রে ফেললেন আমাকে। তিনি হয়তো দেখেনইনি যে ছোট্ট একটা ছেলে তন্ময় হয়ে তাঁর গান শুনছে। তাঁর কণ্ঠে আপনার গান। পরে জেনেছি তাঁর নাম কণিকা বন্দ্যোপাধ্যায়। — শ্রীচরণেষু, আজও সেই স্মৃতিতে তন্ময় হয়ে আছি।

আপনার গানে গানে তন্ময় হয়ে থাকা, সে তো সেই ছেলেবেলা থেকে শুরু হয়েছে। আমার বাবা-মা কিন্তু আপনার নাম শুনলেই গড় করতে শেখাননি। আপনার গানগুলি শিখিয়েছিলেন।

বেতার আর গ্রামোফোন রেকর্ড থেকেও আপনার কত গান শিখে নিয়েছি। ছেলেবেলা থেকে শুনে এসেছি রাজেশ্বরী দত্তর গান, পঙ্কজ কুমার মল্লিকের গান। সুচিত্রা মিত্র, কণিকা বন্দ্যোপাধ্যায়, হেমন্ত মুখোপাধ্যায়ের গান। সব আপনারই। মন প্রাণ দিয়ে শুনেছি। তুলে নিয়েছি হুবহু।

কিন্তু বয়স বেড়ে যাওয়ার পর স্বরলিপি পড়তে গিয়ে দেখতে পেয়েছি মিলছে না অনেক জায়গায়। তাহ'লে কি আগেকার বড় বড় শিল্পী ভুল গেয়ে গিয়েছেন? নাকি স্বরলিপিতে কোথাও কোথাও এদিক ওদিক হয়ে গিয়েছে? আপনার মতটা যদি জানতে পারতাম আমরা!

আমার কিন্তু আগেকার শিল্পীদের গাওয়া বেশ কিছু গান স্বরলিপির সুরগুলোর চেয়ে বেশি ভালো লাগে।

আগেকার রেকর্ডে আপনার গানগুলি শুনলে মনে হয় গান শুনছি। আজকাল অনেক রেকর্ড শুনলে খালি মনে হয় স্বরলিপিটাই শুনছি যেন। আপনিই বলুন, শুধু স্বরলিপিগুলো হুবহু অনুসরণ করে গেয়ে দিলেই কি তা আপনার গান হবে? স্বরলিপির সামান্য হেরফের হলেই কি অমনি আপনার সব কাজ বিফলে যাবে? আর ভাব? স্বরলিপির দিকে পেস্তাচেরা (শব্দটা সমর সেনের কবিতা থেকে ধার করলাম, শ্রীচরণেষু) চোখ রেখে, পদস্খলনের ভয়ে কাঁপতে কাঁপতে ভাবটাই যদি ফোটাতে না পারলাম তো সেটা গান হবে কী ক'রে?

আমি অতি সামান্য মানুষ, শ্রীচরণেষু। কিন্তু আপনার অনেক গান আমার আবাল্যের সঙ্গী। তেমনি আপনার কিছু গান আমার ভালো লাগে না। আমার মন বলছে, এই কথাটা প'ড়ে আপনি হেসে ফেলবেন। প্রশ্রয়ের হাসি। দস্তুর বুড়ো (এবারে আপনারই কথা ধার ক'রে নিলাম, শ্রীচরণেষু) আপনার পছন্দের মানুষ নয়। কিন্তু মুশকিল হ'ল, আপনার নাম এদেশের দস্তুর বুড়োরাই বেশি নেয়। সব কিছুর ওপর খালি 'দস্তুরের মই' চালিয়ে দেবেই দেবে, এমন বেরসিক।

আপনার সব গান সক্কলের সারাক্ষণ ভালো লাগতেই হবে। প্রতিটি গান সমান ভালো লাগতে হবে। এরকম একটা আইন যেন চালু। কোনো কথা বলার জো নেই। ট্যাঁ ফুঁ করলেই অমনি 'রবীন্দ্রবিরোধী' ছাপ প'ড়ে যাবে। বাঙালির মগজে এমন একবগ্গা ফ্যাসিজ্‌ম্‌ বসত গাড়বে — এমনটি আপনি ভাবতে পেরেছিলেন কি কখনও?

একবার কোথায় যেন ব'লে ফেলেছিলাম যে আপনার গানে ক্রিয়াপদের সাধু ও চলিতরূপের সহাবস্থান আমার সামঞ্জস্যহীন ও অনাধুনিক মনে হয়। আপনার যুগে এটার চল ছিল। কিন্তু আজ মনে হয়, একই গানের শরীরে কখনও ক্রিয়াপদের সাধুরূপ, কখনও বা চলিতরূপ বিসদৃশ, বেখাপ্পা। — ব্যস্‌। আর যাই কোথায়, শ্রীচরণেষু! প্রায় ধোপা-নাপিত বন্ধ হবার জোগাড়।

কত ভদ্রলোক ভদ্রমহিলা যে সে-সময়ে খবরকাগজে চিঠি লিখেছিলেন আমার বিরুদ্ধে, কেউ কেউ বাড়িতে টেলিফোন ক'রে গালাগাল দিয়েছিলেন। আমাকে আপনার বিরোধী সাব্যস্ত ক'রে সে-কী সংহারমূর্তি!

একটা বাংলা কাগজ তো আমার গাড়ির সঙ্গে অন্য একটা গাড়ির ধাক্কা থেকে গজিয়ে ওঠা এক উদ্ভট গোলমালের একেবারে আজগুবি একখানা গল্প ফেঁদে, হেড-লাইন-টেড-লাইন ছাপিয়ে একাকার। আপনার ভক্তরা নাকি আমাকে আমার রবীন্দ্রবিরোধিতার কারণে রাস্তায় হেনস্তা করেছেন!

আপনি একবার ভাবুন, শ্রীচরণেষু, এই ধরনের কাগজে যাঁরা লেখেন, কাগজটা যাঁরা প্রকাশ করেন, তাঁরাও আপনার গান শোনেন।

আপনার গান গাওয়া আর শোনা নিয়েই যত গোলমাল। আপনি যদি অলৌকিক কোনো প্রক্রিয়ায় এখন আমাদের মধ্যে এসে, অন্য চেহারা আর অন্য-কোনো নাম নিয়ে নিজের গান রেকর্ড করতে যেতেন তো, আমার মনে হয়, স্বরলিপির তাঁবেদারি করতে করতেই হাঁফিয়ে উঠতেন। তাছাড়াও কত লোক হয়তো আপনাকে শুনিয়ে দিত : 'রবীন্দ্রসঙ্গীতটা আপনার গলায় ঠিক মানায় না।'

আপনার গান কার গলায় মানায়, কার গলায় মানায় না — সেটাও অনেকে ঠিক ক'রে ব'সে আছেন। মধ্যবিত্ত বাঙালির মধ্যে, শ্রীচরণেষু, কত লোক যে কত বিষয়ে পণ্ডিত, তা আপনি ভাবতেও পারবেন না। আর গানবাজনার ব্যাপারে তো কথাই নেই।

আপনার গানের সঙ্গে কোন বাজনা বাজা উচিত, তা নিয়েও বিস্তর ঝগড়াঝাটি। একদল তো আপনাকে শুধু এসরাজে আটকে রাখতে চেয়েছেন। ভাবুন দেখি, 'প্রাণ চায় চক্ষু না চায়'-এর সঙ্গে শুধু এসরাজ বাজছে!

আমরা বেশ মজার অবস্থায় এসেছি, শ্রীচরণেষু। একদিকে আমরা আপনার গানগুলিকে সবচেয়ে আধুনিক, চির-আধুনিক বলি। অন্যদিকে আবার আপনার গানের সঙ্গে আধুনিক যন্ত্র বাজলেই আমরা মাৎ মাৎ ক'রে তেড়ে উঠি।

আমার ধারণা, আজকাল আমরা যেসব যন্ত্র বাজাই সেগুলো শুনলে আপনার ভালোই লাগত। আজকের দিনে সিন্‌থেসাইজার, স্যাম্পলার, গিটার, নানান ইলেকট্রিক তালযন্ত্র — এসব শুনলে আপনি বোধহয় খুশিই হতেন। বাড়াবাড়ি করলে বকতেনও নিশ্চয়ই।

আপনার অনেক সুরের সঙ্গে এখনকার একাধিক যন্ত্র দিব্যি খাপ খায়। কত গান আছে, যেগুলোর সঙ্গে তবলার বদলে পিয়ানো বা নরম করে বাজানো গিটার, বিশেষ করে নাইলন-তারের গিটারের সাহায্যে সুরতালছন্দ রাখলে একটা নতুন মেজাজ, আনন্দ পাওয়া যায়।

আমি একবার জার্মানিতে আপনার 'গ্রাম ছাড়া ঐ রাঙা মাটির পথ'-এর সুরটি শুনেছিলাম স্যাক্‌সোফোন ও পিয়ানোয়। দুই জার্মান শিল্পী যে কী অনবদ্য কাজ করেছিলেন! আপনিও বোধহয় শুনে নিয়েছেন। আকাশ থেকে বাজনা শুনতে শুনতে আমার খালি মনে হচ্ছিল, আপনি আশীর্বাদ করছেন আপনার দুই জার্মান সন্তানকে, নয়তো অমন রস তাঁরা সৃষ্টি করেছিলেন কী ক'রে!

শ্রীচরণেষু, আপনার কখনো মনে হয়নি যে পাশ্চাত্যের অর্কেস্ট্রায় আপনার অনেক গানের সুর একটা অন্য মাত্রা পেত! ডাব্‌ল্ বেস, চেলো, ভায়োলিন, ভিয়োলা, ওবো, ট্রম্‌বোন্, ট্রাম্‌পেট, ফ্রেঞ্চ হর্ন, ইংলিশ হর্ন, ফ্লুট, হার্প, পিয়ানো — সবাই মিলে, পার্ট ভাগাভাগি ক'রে আপনার কিছু রচনা বাজাচ্ছে — এ আমার স্বপ্ন, শ্রীচরণেষু। এক দক্ষ পরিচালক অর্কেস্ট্রা রচনা ক'রে দিয়েছেন। তাঁর বেটনের ইঙ্গিতে বেজে উঠছে আপনার সুর! আপনি অলক্ষ্যে শুনছেন। শুনছেন বিশ্ববাসী। — শ্রীচরণেষু, কোনোদিন কি এ-স্বপ্ন সফল হবে?

আমাদের দেশে অনেকেই বোধহয় স্বপ্ন দেখেছিলেন, আপনার গানের কপিরাইট উঠে গেলে বেশ হয়। কোনো কোনো গুণীজনও কপিরাইট নতুন ক'রে বলবৎ করার বিরুদ্ধে ছিলেন। আমার কিন্তু মনে হয, আমরা 'স্বাধীনতা' ব্যাপারটাকে 'যথেচ্ছাচারের' সঙ্গে গুলিয়ে ফেলি। নিয়ন্ত্রণ আমাদের ধাতে সয় না। কিন্তু নিয়ন্ত্রণ না থাকলে আমরা বেসামাল হয়ে পড়ি।

আমার ভাবতে ভয় করে, শ্রীচরণেষু, বিশ্বভারতীর নিয়ন্ত্রণ উঠে গেলে আমরা আপনার গানগুলো নিয়ে কী করব। আমরা কি সুরসিকের

মতো পরিমিতিবোধের পরিচয় দেব? নাকি যা ইচ্ছে তাই করব? যে যার মতো পণ্ডিতি ফলাব, যেভাবে খুশি গাইব, বাজাব?

এখন তো, শ্রীচরণেষু, পয়সা দিলেই ক্যাসেট করা যায় অনেক কম্পানি থেকে। ভাবুন একবার, আপনার কাঁধে বন্দুক রেখে কত লোক কেরামতির স্থায়ী নজির রাখতে চাইবে রেকর্ডিং-এর মাধ্যমে। এই 'সি ডি' অবশ্য, শ্রীচরণেষু, ক্যাসেটের মতো অত সহজে তৈরি করা যাবে না। কিন্তু কয়েক বছরের মধ্যেই ব্যাপারটা একটু সহজ হয়ে যাবে বৈকি। ভাবুন একবার। এই নতুন বস্তুটির আয়ু একশ' বছর! অর্থাৎ আপনার গান নিয়ে যথেচ্ছাচার হ'লে এবং সেই কীর্তিটি 'সি ডি'-তে ধ'রে রাখলে শ'খানেক বছরের জন্য নিশ্চিন্ত।

এইসব ভেবে ভেবে আমি শিউরে উঠি। আমি জানি, শ্রীচরণেষু, আমার গলায় আপনার গান শুনেও কেউ কেউ শিউরে ওঠেন। যাক্, শিউরে ওঠায় অন্তত আমরা সবাই এক।

শিহরণ খেলে যায়, যখন শুনি আপনার আধুনিক গানগুলোকে কেউ বিশ শতকের এই শেষভাগে এসেও নানান রাগরাগিণীর তেলে ভেজে ভেজে পরিবেশন করেছেন। আপনারই বলা কথা "তুমি নব নব রূপে এসো প্রাণে" এ-কী শোচনীয় প্যারোডি, শ্রীচরণেষু!

আমার নানান বদোভ্যেসের মধ্যে একটা হল আপনার 'সংগীতচিন্তা' বইটি ওল্টানো। তারই একজায়গায় দেখছি আপনি লিখে গিয়েছেন ঃ "উৎকৃষ্ট হিন্দুস্থানী সংগীত আমি ভালোবাসি বলেছি বহুবারই। কেবল আমি বলি যে, ভালো জিনিসকেও ভালোবাসতে হবে মোহমুক্ত হয়ে। সব রকমের মোহ সর্বনেশে। তাজমহল আমার ভালো লাগে ব'লেই যে তাজমহলের স্থাপিত্যশিল্পের অনুকরণে প্রতি বসতবাটীতে গম্বুজ ওঠাতে হবে এ কখনোই হ'তে পারে না।

হিন্দুস্থানী সংগীত ভালো লাগে ব'লেই যে তার ক্রমাগত পুনরাবৃত্তি করতে হবে এ একটা কথাই নয়। অজন্তার ছবি খুবই ভালো কে না মানবে? কিন্তু তাই ব'লে তার উপর দাগা বুলিয়ে আমাদের চিত্রলোকে মুক্তি খুঁজতে হবে বললে সেটা একটা হাসির কথা হয়।"

আসলে কী জানেন, এই "দাগা বোলানোর" ব্যাপারটা আপনার যত অপছন্দই হোক, আমাদের মধ্যে কারুর কারুর আবার এটাই পছন্দ। যে আধুনিক গান আপনি সৃষ্টি ক'রে গিয়েছিলেন, সেই গান তো অনেকটা পথ এগিয়েছে। আমরা কেউ কেউ এই এগোনোর ব্যাপারটা ঠিক মানতে চাই না। আমাদের মধ্যে কেউ নতুন কিছু করে দেখালেই, শ্রীচরণেষু, একদল লোক অমনি চেঁচিয়ে ওঠে ঃ 'আরে, ছোঃ, এ আর নতুন কী?

সবই তো আগেই ছিল!' — এই ফাঁকে আপনাকে ব'লে রাখি, সম্প্রতি একটি পত্রিকার সাক্ষাৎকারে এক প্রবীণ সংগীতরসিক ও গানের শিক্ষক ব'লেছেন যে সলিল চৌধুরীর গানে তিনি কোনো নতুনত্ব পাননি। দোহাই আপনার, ভ্রূকুটিতে দগ্ধ করবেন না ঐ কথাগুলো। আপনার যুগেও কোনো-না-কোনো 'সংগীতবোদ্ধা' আপনার গান সম্পর্কেও এমন কথা ব'লেছিলেন হয়তো। আমরা নয়তো বাঙালি হলাম কিসে! — যা বলছিলাম, শ্রীচরণেষু, একদল তো চেঁচিয়ে উঠবেন 'আরে ছোঃ, এ আর নতুন কী' এই বলে। আর-একদল আবার গোঁ ধরবেন ঃ 'নতুনের নিকুচি করেছে, পুরনো গানগুলোই ভালো ছিল। ওগুলোরই চর্চা ক'রে যাওয়া দরকার।'

আগেকার কিছু গান নিশ্চয়ই ভালো ছিল। আজও সেগুলি শুনতে ভালো লাগে। কিন্তু "ভালো লাগে ব'লেই যে তার ক্রমাগত পুনরাবৃত্তি করতে হবে এ একটা কথাই নয়।" — এই রে! আবার আপনার লেখা থেকে উদ্ধৃতি দিয়ে ফেললাম। আপনি স্নেহের হাসি হাসছেন, জানি। কিন্তু ঐ 'পুরনো-গানগুলোই-গেয়ে-যাও-গেয়ে-যাই'-এর দল হাসছেন না, দাঁত কিড়মিড় করছেন যে!

আমি ঠিক জানি না শ্রীচরণেষু, আপনার আমলে খবরকাগজগুলো আপনার গানের প্রসঙ্গে কী কী লিখত। আদৌ কিছু লিখত কি?

এখন কিন্তু বাংলা কাগজগুলোয় গানের জগৎ ও ব্যবসা নিয়ে প্রচুর লেখা বেরোয়। তবে গানের বিশ্লেষণ, লিরিক ও সুরতালছন্দের বিচার বিবেচনা সেখানে থাকে না বিশেষ, কার গান কত বিকোলো, কারটা তেমন বিকোলো না, কোন নতুন গানের কারিগর সম্পর্কে বা নতুন গান প্রসঙ্গে ও-পাড়ার শিবুদা অথবা কোনো ক্যাসেটের দোকানদার কী বললেন, সে-সব কথাই থাকে বেশি। আর থাকে কাগুজে লেখকদের ব্যক্তিগত বা গোষ্ঠীগত পছন্দ-অপছন্দভিত্তিক মন্তব্য। সেইসঙ্গে ঢালাও সিদ্ধান্ত। যদিও, সেই সিদ্ধান্তে পৌঁছনোর রাস্তায় সাঙ্গীতিক বিশ্লেষণ ও যুক্তির ছিটেফোঁটাও নেই।

আসলে, ১৯৯২ সাল থেকে, শ্রীচরণেষু, আধুনিক বাংলা গান নিয়ে বেশ তোলপাড় হ'তে শুরু করেছে। ঐ বছর কী-কুক্ষণেই যে 'তোমাকে চাই' নামে একটা আধুনিক গানের ক্যাসেট বেরিয়েছিল! লজ্জার মাথা খেয়ে আপনাকে বলি, আমারই বাঁধা গান। কপালজোরে কেমন যেন নাম ক'রে গেলাম, শ্রীচরণেষু। আপনি তো অন্তর্যামী। সবই জানেন। কত বছর, কত পরিশ্রম যে করেছি! স্বপ্নেও কখনো ভাবিনি যে লোকে টিকিট কেটে আমার বাঁধা এইসব গান শুনতে আসবে। ক্যাসেট কিনবে। কখনো

সবই তো আগেই ছিল!' — এই ফাঁকে আপনাকে ব'লে রাখি, সম্প্রতি একটি পত্রিকার সাক্ষাৎকারে এক প্রবীণ সংগীতরসিক ও গানের শিক্ষক ব'লেছেন যে সলিল চৌধুরীর গানে তিনি কোনো নতুনত্ব পাননি। দোহাই আপনার, ভ্রূকুটিতে দগ্ধ করবেন না ঐ কথাগুলো। আপনার যুগেও কোনো-না-কোনো 'সংগীতবোদ্ধা' আপনার গান সম্পর্কেও এমন কথা ব'লেছিলেন হয়তো। আমরা নয়তো বাঙালি হলাম কিসে! — যা বলছিলাম, শ্রীচরণেষু, একদল তো চেঁচিয়ে উঠবেন 'আরে ছোঃ, এ আর নতুন কী' এই বলে। আর-একদল আবার গোঁ ধরবেন ঃ 'নতুনের নিকুচি করেছে, পুরনো গানগুলোই ভালো ছিল। ওগুলোরই চর্চা ক'রে যাওয়া দরকার।'

আগেকার কিছু গান নিশ্চয়ই ভালো ছিল। আজও সেগুলি শুনতে ভালো লাগে। কিন্তু "ভালো লাগে ব'লেই যে তার ক্রমাগত পুনরাবৃত্তি করতে হবে এ একটা কথাই নয়।" — এই রে! আবার আপনার লেখা থেকে উদ্ধৃতি দিয়ে ফেললাম। আপনি স্নেহের হাসি হাসছেন, জানি। কিন্তু ঐ 'পুরনো-গানগুলোই-গেয়ে-যাও-গেয়ে-যাই'-এর দল হাসছেন না, দাঁত কিড়মিড় করছেন যে!

আমি ঠিক জানি না শ্রীচরণেষু, আপনার আমলে খবরকাগজগুলো আপনার গানের প্রসঙ্গে কী কী লিখত। আদৌ কিছু লিখত কি?

এখন কিন্তু বাংলা কাগজগুলোয় গানের জগৎ ও ব্যবসা নিয়ে প্রচুর লেখা বেরোয়। তবে গানের বিশ্লেষণ, লিরিক ও সুরতালছন্দের বিচার বিবেচনা সেখানে থাকে না বিশেষ, কার গান কত বিকোলো, কারটা তেমন বিকোলো না, কোন নতুন গানের কারিগর সম্পর্কে বা নতুন গান প্রসঙ্গে ও-পাড়ার শিবুদা অথবা কোনো ক্যাসেটের দোকানদার কী বললেন, সে-সব কথাই থাকে বেশি। আর থাকে কাগুজে লেখকদের ব্যক্তিগত বা গোষ্ঠীগত পছন্দ-অপছন্দভিত্তিক মন্তব্য। সেইসঙ্গে ঢালাও সিদ্ধান্ত। যদিও, সেই সিদ্ধান্তে পৌঁছনোর রাস্তায় সাঙ্গীতিক বিশ্লেষণ ও যুক্তির ছিটেফোঁটাও নেই।

আসলে, ১৯৯২ সাল থেকে, শ্রীচরণেষু, আধুনিক বাংলা গান নিয়ে বেশ তোলপাড় হ'তে শুরু করেছে। ঐ বছর কী-কুক্ষণেই যে 'তোমাকে চাই' নামে একটা আধুনিক গানের ক্যাসেট বেরিয়েছিল! লজ্জার মাথা খেয়ে আপনাকে বলি, আমারই বাঁধা গান। কপালজোরে কেমন যেন নাম ক'রে গেলাম, শ্রীচরণেষু। আপনি তো অন্তর্যামী। সবই জানেন। কত বছর, কত পরিশ্রম যে করেছি! স্বপ্নেও কখনো ভাবিনি যে লোকে টিকিট কেটে আমার বাঁধা এইসব গান শুনতে আসবে। ক্যাসেট কিনবে। কখনো

শ্রীচরণেষু, আপনার যুগে গ্রামোফোন রেকর্ড কম্পানি ছিল গোণা-গুণতি। আজ সেখানে প্রচুর ক্যাসেট কম্পানি। ১৯৯২-এর পর অনেক কম্পানিই চাইলেন ঝোপ বুঝে কোপ মারতে। কতকটা সুকুমার রায়ের 'পাগলা দাশুর' সেই পদ্য-লেখা নিয়ে স্কুলময় মাতামাতির গল্পটার মতো নতুন গান বাঁধা ও ক্যাসেট করার হুজুগ উঠল। সে-এক মহা জটিল অবস্থা, শ্রীচরণেষু। আপনি তো সবই লক্ষ্য ক'রে গেছেন। এটাও নিশ্চয়ই আপনার নজর এড়ায়নি যে একদল লোক অমনি খুব ঈর্ষাকাতর হয়ে পড়ল। তা ছাড়া 'এসব হচ্ছেটা কী? নতুন-ফতুন হটাও' বলার লোক তো থাকেই। ঠিক যেমন, শ্রীচরণেষু, 'সবই আগে ছ্যালো' বা 'ভালো কাজগুলো আগেই হয়ে গেছে' বলার লোকও থাকে।

এই যেমন, কোনো কোনো নিতান্ত স্নেহশীল মানুষ আমাকে 'নতুন ধারার গানের পথিকৃৎ' বলে ফেলায় জানা গেল আমার আগে আরও কতজন কত কী ক'রে ফেলেছিলেন। শুধু ১৯৯২ সালের মাতামাতি শুরু হওয়ার আগে লোকে বিশেষ জানত না, এই যা। শ্রীচরণেষু, আমি জানি একথা লেখার অপরাধে কেউ কেউ আমাকে তুলোধনা করবেন। কিন্তু উপযুক্ত গান লিখে, সুর ক'রে, গেয়ে-বাজিয়ে গুটিকয়েক নিরপেক্ষ হৃদয়কে স্পর্শ করতে পারবেন কি তাঁরা?

আসলে কি জানেন, আমিও নেহাত মানুষ তো। জিতেন্দ্রিয় ঋষি নই। তাই যেটুকু কাজ আমি করতে পেরেছি, সেটুকুর জন্যেও যখন সাধুবাদের পরিবর্তে অপমান সহ্য করতে হয়, ঈর্ষার শিকার হতে হয়, কিছু কিছু ব্যক্তি বা গোষ্ঠী যখন আপ্রাণ চেষ্টা করেন আমাকে ছোট করতে, তখন কষ্ট হয়।

যাই হোক, সব মিলে মিশে জগাখিচুড়ি পাকিয়ে ব্যাপারটা দাঁড়িয়েছে এই যে, একদল লোক নতুন গানের পক্ষে, আর-একদল বিপক্ষে। কেউ কেউ আবার বেশ বিষাক্তভাবে বিপক্ষে। কেমন জানেন? আমি অনুমান করছি, কয়েকটি পত্রিকার দিকে আপনি আর তাকান না বিশেষ। একটি বড় পত্রিকার জনৈক রিপোর্টারকে এক শিল্পী বলেছিলেন : আপনার তো দাড়ি আছে, আপনি গান করুন না, নাম ক'রে যাবেন। — উদ্ধৃতিটা হুবহু ঠিক হ'ল না হয়তো, শ্রীচরণেষু, কিন্তু মোটের ওপর এরকম কথাই ছাপা হয়েছিল।

শ্রীচরণেষু, এ-অধমের অপরাধ নেবেন না। আপনার যুগে কোনো ঈর্ষাপরায়ণ মানুষ কি দাড়ির প্রসঙ্গ তুলেও কথা বলতেন?

আমাদের যুগে এসব চলে, শ্রীচরণেষু।

এখন চলছে জোরেসোরে পুরনো-নতুনে এক বিরক্তিকর বিবাদ। পুরনোবাদীরা পুরনো পুরনো বাংলা গানে "দাগা বুলিয়ে" সংগীতলোকে

"মুক্তি খুঁজতে" চাইছেন। আর নতুনবাদীরা কেউ কেউ চেষ্টা ক'রে চলেছেন নতুন নতুন গান বাঁধতে, মানুষকে শোনাতে।

পুরনোবাদীরা আগেকার গানগুলি নতুন ক'রে গেয়ে রেকর্ড ক'রে চলেছেন। এটা করতে গিয়ে গানে গানে প্যাঁচও লেগে যাচ্ছে, শ্রীচরণেষু। দু'তিনজন অতীতের একই আধুনিক গান রেকর্ড ক'রে ফেললেন। কী গেরো ভাবুন। পুরনোবাদীদের আধুনিক গানের আকাশটা শিগ্‌গিরই হয়তো বিশ্বকর্মা পুজোয় কলকাতার আকাশের মতো দেখাবে। কোন ঘুড়িটা যে কোন ঘুড়ির সঙ্গে প্যাঁচ খেলছে, চট করে বোঝার জো নেই।

নতুনবাদীদের ঘাড়ে, শ্রীচরণেষু, গুরুভার। এক একটা ক্যাসেটে অন্তত আটটা-দশটা গান রাখতে হয়। মাসে প্রত্যেকটা ক্যাসেটের জন্য এতগুলো নতুন গান বাঁধতে হবে। ক্রমাগত নতুন গান বেঁধে যাওয়া সহজ নয়। সকলের কাজও নয়। তবু, হে বাংলা আধুনিক গানের অবিসম্বাদিত পথিকৃৎ (আপনার কাজগুলি আপনারও আগে কেউ কেউ ক'রে গেছেন — এটা বলার দুঃসাহস কারুর আবার নেই), কেউ কেউ চেষ্টা ক'রে যাবে। কারণ, আপনিও তো এই কথাই ব'লে আসছেন বারবার যে, "নবসৃষ্টির যত দোষ যত ত্রুটিই থাকুক না কেন, মুক্তি কেবল ওই কাঁটাপথেই — বাঁধা সড়ক গোলাপফুলের পাপড়ি দিয়ে মোড়া হলেও সে পথ আমাদের পৌঁছিয়ে দেবে শেষটায় চোরা গলিতেই। আমরা মুক্তিপন্থী, আর মুক্তি কেবল নব সৃষ্টির পথেই — গতানুগতিকতার নিষ্কলঙ্ক সাধনার পথে নৈব নৈব চ।"

ইতি —
আপনারই গান শুনতে
শুনতে জন্মেছে আর
আপনারই গান শুনতে
শুনতে মরতে চায় এমন
একজন নতুনবাদী।

পুনশ্চ ঃ আমার কয়েকজন বন্ধু এই চিঠিটা প্রকাশ করবেন। ফলে কেউ না কেউ এটা প'ড়েও ফেলবেন। তাঁদের আর-একটু ভাবিয়ে তোলার অভিসন্ধিতে আপনার লেখা থেকে আর একটি উদ্ধৃতি দিচ্ছি ঃ

"সংগীতে এতখানি প্রাণ থাকা চাই, যাহাতে সে সমাজের বয়সের সহিত বাড়িতে থাকে, সমাজের পরিবর্তনের সহিত পরিবর্তিত হইতে থাকে, সমাজের উপর নিজের প্রভাব বিস্তৃত করিতে পারে ও তাহার উপর সমাজের প্রভাব প্রযুক্ত হয়।"

নিজেকে যে পাল্টায়

হুল্‌ফ্‌ বিয়ারমানের কথা শুনি ১৯৭৫ সালে পশ্চিম জার্মানিতে। শুনলাম, পূর্ব জার্মানিতে নাকি একজন মানুষ আছেন যিনি গান বাঁধেন, গান করেন। সেইসব গান শুনে পূর্ব জার্মানির কমিউনিস্ট সরকার নাকি বেজায় খাপ্পা। এতটাই যে বিয়ারমানকে বাইরে গান গাইতে দেওয়া হয় না। তাঁর গানের গ্রামোফোন রেকর্ড ও চোরাই রেকর্ড পশ্চিমে পৌঁছে গিয়েছিল সরকারি নিষেধাজ্ঞা জারি হওয়ার আগেই। পশ্চিমের অনেকেই তাঁর কথা জেনে গিয়েছিলেন।

বিয়ারমান কিন্তু আসলে জার্মানির পশ্চিমভাগের মানুষ। অর্থাৎ ব্যাপারটা এমন নয় যে তিনি জন্মসূত্রে পূর্বদিকের; দেশভাগ হ'ল; ফলে তিনি পূর্ব জার্মানিতেই থেকে গেলেন। না। ইচ্ছে করলে তিনি পশ্চিম জার্মানিরই নাগরিক হতে পারতেন। তিনি তা চাননি। অল্প বয়সে তিনি স্বেচ্ছায় পূর্ব জার্মানিতে চ'লে গিয়েছিলেন। তিনি মার্কসবাদী। সমাজতন্ত্রে বিশ্বাসী। থাকতে চেয়েছিলেন সমাজতান্ত্রিক পূর্ব জার্মানিতে।

কালক্রমে তিনি পূর্ব জার্মানির শাসনতন্ত্রে এবং শাসক দলের ভেতর নানান দ্বন্দ্ব দেখতে পান। তিনি এবং তাঁর মতো আরও কেউ কেউ চাইছিলেন দ্বন্দ্বগুলো ঘুচে যাক, দেশে পার্টিতন্ত্রের জায়গায় সত্যিকার গণতন্ত্র আসুক। পার্টির গা-জোয়ারি, স্বেচ্ছাচার বিদায় নিক। নেতারা সাধারণ মানুষের কথা বুঝুন, ভাবুন। তাঁরা আরও সহনশীল হোন, বিরোধীদের প্রতি খড়্গহস্ত না হয়ে তাঁদের সমালোচনায় কর্ণপাত করুন।

বিয়ারমান কখনো চাননি পূর্ব জার্মানিতে পুঁজিবাদ আসুক, পশ্চিমী ধাঁচে শাসনতন্ত্র গড়ে উঠুক। সাতের দশকেও অনেকে স্বপ্ন দেখতেন। স্বপ্ন দেখার সাহস রাখতেন। বিয়ারমানের স্বপ্ন ছিল — একদিন শ্রেণীহীন সমাজ গঠিত হবে। শ্রেণীই হোক, রাজনৈতিক দলই হোক, রাষ্ট্রনীতিই হোক— কোনো অজুহাতেই মানুষ আর মানুষকে শোষণ করবে না, পীড়ন করবে না। সাধারণ দলছুট মানুষেরও জায়গা হবে। কষ্টে পাবার জন্য ব্যক্তিকে আর কোনো প্রতিষ্ঠান বা দলের তাঁবেদারি করতে হবে না।

এসব বড় বেয়াড়া স্বপ্ন। এ-স্বপ্ন যাঁরা পুঁজিবাদী সমাজে দেখেন তাঁরা বিপদে পড়তে পারেন। যাঁরা 'কমিউনিস্ট' সমাজব্যবস্থায় দেখেন, এমনকি তাঁরাও। আদর্শ কমিউনিস্ট রাষ্ট্র কোথাও তৈরি হয়েছে কিনা জানি না। এটুকু জানি যে 'কমিউনিস্ট' তকমা লাগানো একাধিক রাষ্ট্রে সরকার বিরোধীদের তো বটেই, এমনকি সরকার ও কমিউনিস্ট পার্টির সমালোচকদেরও পস্তাতে হয়েছে। প্রাক্তন

পূর্ব জার্মানির শাসকদলের নাম অবশ্য 'কমিউনিস্ট' ছিল না, ছিল 'সমাজবাদী ঐক্য দল।' কিন্তু তাঁদের আসল পরিচয় ছিল 'কমিউনিস্ট'। সেই শাসকদলের সমালোচনা ক'রে বিয়ারমান পড়লেন মহা ফ্যাসাদে।

তিনি ছিলেন (আজও তিনি তাইই) জার্মান ভাষায় যাকে বলে 'লিডারমাখার' (Liedermacher)। বাংলায় বলা হয় 'গান বাঁধিয়ে'। 'গানের কারিগর' নামটি আমি বাংলায় চালু করেছি ঐ 'লিডারমাখার' নামটিকেই অনুসরণ ক'রে। জার্মানির 'লিডারমাখার'রা জীবন ও সমাজের নানান দিক নিয়ে গান বাঁধেন ও গেয়ে বেড়ান। তাঁরা যে সবাই খুব উঁচুদরের কথাশিল্পী তা নয়। তবে গানটা তাঁরা বিলক্ষণ জানেন। বিষয়টি নিয়ে তাঁরা চর্চা করেছেন। অনেকে যথাসাধ্য শিখেছেন। এরপর তাঁরা বিভিন্ন বিষয়, ঘটনা ইত্যাদি নিয়ে গান বেঁধেছেন, গেয়ে বেড়িয়েছেন। সচরাচর দেখা গিয়েছে যে এঁরা একাই গান করেন ও বাজান। কেউ নেন গিটার, কেউ বা ব্যাঞ্জো, কেউ বা 'ব্যান্ডোনিয়ন' নামে একর্ডিয়ন ধরনের একটি যন্ত্র। কোলনের বিখ্যাত পথগায়ক ও গান-বাঁধিয়ে 'ক্লাউস, ডেয়র গাইগার' বা 'বেহালাবাজিয়ে ক্লাউস' যেমন একটি বেহালা বাজাতে বাজাতে গাইতেন। তাঁকে আমি কোলনের একটি রাজপথে গাইতে-বাজাতে ও সেইসঙ্গে নাচতে দেখেছি। তিনি নিজেই নিজের ক্যাসেট বিক্রি করতেন। প্রসঙ্গত কলকাতার রাস্তায় এত আওয়াজ, এত দূষণ যে এ শহরে 'বেহালাবাজিয়ে ক্লাউস' দু-একদিনের মধ্যেই 'বোবা ক্লাউস' বনে যেতেন।

যাই হোক, পশ্চিম জার্মানির আর-এক অসাধারণ গানের কারিগর রাইনহার্ড মায় অনুষ্ঠান করেছেন শুধু গিটার নিয়ে। তিনি আবার গায়ক হিসেবেও চমৎকার।

হল্‌ফ্‌ বিয়ারমানও শুধু একটি গিটার নিয়ে গেয়ে আসছেন। গায়ক হিসেবে তিনি যে খুব ভালো, তা হয়তো নয়। তবে তাঁকে অগায়ক বলা যাবে না। গান তিনি বিলক্ষণ গাইতে পারেন। আর গিটার তিনি সত্যিই অসাধারণ বাজান।

কিন্তু, তাঁর নৈপুণ্য এবং জনপ্রিয়তা সত্ত্বেও পূর্ব জার্মানির সরকার তাঁকে কোণঠাসা ক'রে রেখেছিলেন,— অথবা হয়তো সেই কারণেই।

বিদেশ থেকে ডাক আসত। বিয়ারমান ছাড়পত্র পেতেন না। গানের কারিগর ও গায়ক হিসেবে তিনি হয়ে পড়লেন গৃহবন্দী। শাসকদল তাঁর নামে কুৎসা রটাতে থাকলেন। চেষ্টা করলেন তাঁকে সামাজিকভাবেও একঘরে ক'রে দিতে। পূর্ব জার্মানিতে সবকিছুই ছিল কোনো-না-কোনো ইউনিয়নের অধীন। আর প্রতিটি ইউনিয়ন ছিল শাসকদলের হাতের পুতুল। কাজেই গানের কারিগর, কবি, গায়ক হিসেবে বিয়ারমান ও তাঁর মতো আরও কাউকে কাউকে শাসকদলমুখী শিল্প-সংস্কৃতির জগৎ থেকে নির্বাসনে পাঠানো সম্ভব ছিল। পশ্চিমবঙ্গের মানুষ এ-ব্যাপারে নিজেদের কিছু অভিজ্ঞতার সঙ্গে মিল খুঁজে পাবেন।

একদিন হ'ল কি, একটা ব্যতিক্রম ঘটে গেল। সরকার হঠাৎ বিয়ারমানকে পশ্চিম জার্মানিতে অনুষ্ঠান করতে যাওয়ার অনুমতি দিলেন। বিয়ারমান কোলনে গেলেন, সেই অবসরে পূর্ব জার্মান সরকার তাঁর নাগরিকত্ব হরণ করলেন। বিয়ারমান এটা মানতে চাইলেন না। কিন্তু লাভ হ'ল না। তাঁকে পশ্চিম জার্মানিতেই থেকে যেতে হ'ল।

পূর্ব জার্মানির অনেক নাগরিক পশ্চিম জার্মানিতে চ'লে যাওয়ার জন্য হাঁকুপাঁকু করতেন। বিয়ারমান কিন্তু পশ্চিমে চলে যেতে চাননি। রাইনার কুন্‌ৎসে নামে পূর্ব জার্মানির এক তরুণ কবি শাসকদলের সমালোচনা করার অপরাধে লাঞ্ছিত ও বিতাড়িত হবার পর বিয়ারমান তাঁকে উদ্দেশ্য ক'রে একটি অনবদ্য কবিতা লিখেছেন। তাতে সুর দিয়ে তিনি গাইতেনও। শিথিল তর্জমায় কবিতা-গানটি এইরকম ঃ

'এই ছিন্নভিন্ন দেশে আমাদের স্বপ্নগুলোর কী হবে। আমাদের বন্ধুদের কী হবে। কী হবে তোমার, আমার। ভীষণ চাই এখান থেকে পিট্টান দিতে। এখানেই আবার থাকতে চাই সবচেয়ে বেশি। 'পালাতে চাওয়া আর সেই সঙ্গে থাকতে চাওয়ার এই টানাপোড়েন একসময়ে পূর্ব জার্মানির একটা বড় অংশের যুগচেতনা হয়ে উঠেছিল। অনেকেই পিছুটান ফেলে পালিয়েছিলেন। সীমান্তের নদী সাঁতরে পেরিয়ে পালাতে গিয়ে সমাজতন্ত্রী রক্ষীদের গুলিতে প্রাণ দিয়েছিলেন অনেকেই। সাঁতরে পালাতে চাওয়া অসহায় মানুষদের গুলি ক'রে মারতেন পূর্ব জার্মান সীমান্তরক্ষীরা। তবু লোকে পালাত, চরম ঝুঁকি নিত।

দেশ ছেড়ে চ'লে যেতে চাইলে বিয়ারমানকে কোনো ঝুঁকি নিতে হ'ত না। তিনি স্বেচ্ছায় চলে গেলে তো আপদ বিদেয় হ'ত। গেলেন না। গেলেন সরকারি ছাড়পত্র নিয়ে আমন্ত্রিত শিল্পী হিসেবে গান গাইতে পশ্চিমে। পূর্ব জার্মান সরকার তাঁর দেশে ফেরার পথ বন্ধ করে দিলেন। এটাই ছিল তাঁর শাস্তি।

পশ্চিম জার্মানির বিভিন্ন প্রতিষ্ঠান, খবরকাগজগুলো তো আনন্দে আটখানা। চারদিকে তখন বিয়ারমান, বিয়ারমান, বিয়ারমান। আমি তখন কোলনে। সে-শহরে এক বিরাট ইনডোর স্টেডিয়ামে বিয়ারমান অনুষ্ঠান করছেন। টিকিট পাইনি তাই টেলিভিশনে লেপ্‌টে গিয়েছি। দেখছি, শুনছি — সাদামাটা জামাপ্যান্টপরা এক মাঝবয়সী লোক একটা গিটার হাতে একের পর এক গান গাইছে, কবিতা বলছে, শ্রোতাদের সঙ্গে কথা বলছে, তর্ক করছে, আবার গান ধরছে, বই থেকে পাঠ ক'রে শোনাচ্ছে। কে যেন চেঁচিয়ে কী বলল দর্শকদের ভেতর থেকে। গিটার-হাতে সেই সাদামাটা লোকটা মাইক্রোফোনে হুঙ্কার দিয়ে উঠল — "তোর মতো ফাসিস্তরাই কমরেড ডুম্‌চেক্‌কে হটিয়ে দিয়েছিল একদিন।"

আর পূর্ব জার্মানির কমিউনিস্ট নামধারী ফাসিস্তরা হটিয়ে দিল কমরেড বিয়ারমানকে। সেইদিনই। অনুষ্ঠান চলাকালেই নাগরিকত্ব খোয়ালেন তিনি।

পশ্চিম জার্মানি ও পশ্চিমী দুনিয়ার কাছে বিয়ারমান এক সুবিধেজনক দৃষ্টান্ত হয়ে গেলেন। শুধু তাই নয়, অনিচ্ছে সত্ত্বেও তিনি হয়ে গেলেন পশ্চিম জার্মানির আশ্রিত। প্রায় প্রতি সপ্তাহেই বিয়ারমান সম্পর্কে খবরের ছয়লাপ। বেতারে, টেলিভিশনে তাঁর ঘনঘন অনুষ্ঠান। পশ্চিমের বামবিরোধীরা গদগদ। ভাবটা এইরকম ঃ কী হে, কী বুঝলে? কমিউনিস্ট দেশ থেকে খেদিয়ে দেওয়া কমিউনিস্টকে সেই আমরাই তো ঠাঁই দিলাম।

বিয়ারমান তাঁর পূর্ব জার্মানিতে বাঁধা গানগুলোর সঙ্গে সঙ্গে সদ্য বাঁধা গানও গাইতে শুরু করলেন। এবারে কিন্তু তিনি পশ্চিমে ব'সে গান বাঁধছেন। এবারে মুশকিল শুরু হ'ল পশ্চিমে।

পশ্চিম জার্মানির নির্বাচনের সময়ে বিয়ারমান গান বাঁধলেন দক্ষিণপন্থী ও সামাজিক গণতন্ত্রীদের ঠাট্টা করে। এক বিদেশী নাগরিক একবার পশ্চিম জার্মানিতে ভিসার মেয়াদ বাড়াতে না পেরে ভিসা-অফিসের খোলা জানলা দিয়ে নিচে লাফিয়ে প'ড়ে আত্মহত্যা করেন। তাঁকে নিয়েও গান বাঁধলেন বিয়ারমান। পশ্চিম জার্মানির অনেকের কাছেই বিয়ারমানের গান অস্বস্তিকর ঠেকতে শুরু করল। এর আগে লোকটা গান বাঁধছিল পূর্ব জার্মানির ভেতরকার ব্যাপারস্যাপার নিয়ে। এবারে যে আশ্রয়দাতা দেশ পশ্চিম জার্মানির অন্দরমহলেও লোকটা নাক গলাচ্ছে।

মাঝে মধ্যে বিয়ারমানের নজর জার্মানির বাইরেও যাচ্ছিল। পোল্যান্ডের ধর্মঘটী শ্রমিকরা যখন 'কমিউনিস্ট' সরকারের নীতির প্রতিবাদ করতে গিয়ে প্রার্থনা করতে বসলেন নতজানু হয়ে, অনেক বামপন্থীই আঁৎকে উঠেছিলেন। বিয়ারমান কিন্তু ঘটনাধারাকে দেখছিলেন অন্য চোখে। তিনি লিখলেন : মার্কসকে পেছনে গুঁজে রাখার চেয়ে হাতে ভার্জিন মেরি থাকাও ভালো। — আক্রমণটা আবার ভণ্ড মার্কসবাদীদের ওপর, যাঁদের কার্যকলাপ দেখে বাস্তবিকই মনে হ'তে পারে যে বেচারি কার্ল মার্কস বিয়ারমান-কথিত জায়গাতেই স্থান পেয়েছেন।

পুঁজিবাদী পশ্চিম জার্মানিতে ব'সে দুই জার্মানি সম্পর্কে বিয়ারমানের গান 'এখানে নোংরা টাকা, ওখানে নোংরা শক্তি' তাঁর নির্বাসনকে স্থায়ী রূপ দিয়েছে। একদিকে দুর্গন্ধ অর্থের, অন্যদিকে শাসকদলের রাজক্ষমতার।

কোথাওই ঠিকঠাক ঘর খুঁজে পেলেন না এই প্রতিবাদী কবিয়াল ও গায়ক। দুই জার্মানি এক হয়ে যাবার আগে থেকেই পশ্চিম জার্মানিতে বিয়ারমানের ভূমিকা দুর্বল হ'তে শুরু করেছিল।

সাতের দশকের মাঝামাঝি বিয়ারমানকে নিয়ে হৈ চৈ শুরু হয়েছিল পশ্চিম জার্মানিতে, দশ বছরে তা উবে গেল। ১৯৮৬ সালে ফের চাকরি করতে পশ্চিম জার্মানি গিয়ে দেখি বিয়ারমান তখনও আছেন, তবে তাঁর সেই জোরালো ভূমিকা আর নেই। সমালোচনামূলক গান তিনি তখনও বাঁধছেন, গাইছেন। টেলিভিশনে

তাঁকে মাঝেমধ্যে দেখাও যাচ্ছে। কিন্তু কেমন যেন নিঃসঙ্গ তিনি। কিছুটা নিষ্প্রভ। এমন কি হ'তে পারে, সাতের দশকেও সাম্যবাদীদের মনে যে স্বপ্ন জ্বলজ্বলে ছিল, আটের দশকে তা অনেকটা নিষ্প্রভ হয়ে আসে?

সময় ও পরিবেশের পরিবর্তনের সঙ্গে বিয়ারমানও পাল্টেছেন নিজেকে। এককাট্টা, একবগ্গা তিনি কোনোদিন নন। জীবনকে যিনি ভালোবাসেন, তিনি কি কখনো একবগ্গা হতে পারেন? এমনকি, মার্কসবাদী দর্শনেও কি একদেশদর্শিতার স্থান আছে?

কত পটপরিবর্তন আমরাই তো বেঁচে থাকতে গিয়ে দেখি। পাল্টাই নিজেদেরও। সবাই তা পারি না। আমি আর আগের মতো নেই — একথা বলতে সাহস লাগে কারণ জগৎসংসারের বেশিরভাগ মানুষ যে মুখিয়ে থাকে অনেক দিন পর কারুর সঙ্গে দেখা হ'লে তাকে পরম স্বস্তিতে বলার জন্য ঃ ও মা, তুমি ঠিক আগের মতো আছো, একটুও বদলাও নি। — মানুষ যেন একটুকরো পাথর। গাছও বদলায়। মানুষ তো বদলাবেই। যদি তা না হয় তাহ'লেই বরং চিন্তার কথা।

উপসংহার

১৯৯৫ সালে শ্রী সুদীপ্ত চট্টোপাধ্যায় আমার ওপর একটি তথ্যচিত্র নির্মাণের ব্যাপারে হুল্‌ফ্‌ বিয়ারমানের সঙ্গে যোগাযোগ করেন নিউ ইয়র্ক থেকে। বিয়ারমানের আঙ্গিকের বেশ প্রভাব আছে আমার কাজে, অনুষ্ঠান পরিবেশনের পদ্ধতিতে। বিয়ারমান তা কখনো জানার সুযোগ পাননি। সুদীপ্ত তাঁকে তথ্যচিত্রটি সম্পর্কে জানালে তিনি সুদীপ্তকে তাঁর ছবি, কবিতা, গান ইত্যাদি ব্যবহার করার অনুমতি দেন। সেইসঙ্গে তিনি একটি দীর্ঘ কবিতা পাঠান। শিরোনাম ঃ 'নিজেকে যে পাল্টায়, সেইই কেবল বিশ্বস্ত থাকে নিজের প্রতি।'

"..... এইভাবে আমি ওপরে পৌঁছোলাম। শিশুর মতো সে-কী উত্তেজনা। শিগ্‌গিরই দেখতে পেলাম লাল দেবতাগুলো নেহাত মানুষশুয়োরের বাচ্চাদের মতোই। আমার বাপ আমায় মিথ্যে জাবর কাটার শিক্ষা দেয়নি। আমি তাই আমার সত্যটাই চেঁচিয়ে বললাম ঃ নিজেকে যে পাল্টায়, সেইই কেবল বিশ্বস্ত থাকে নিজের প্রতি।"

"..... গোড়া থেকেই আমি ঠিক জানি না কী করব। সবসময় আমি নতুন ক'রে আশায় বুক বেঁধেছি। এভাবেও বাঁচা যায়। আর বেশি দেরি নেই, মৃত্যু এল ব'লে। সে-স্যাঙাতকে আমি চিনি। প্রায়ই দেখা হয়েছে। এখনও সে আমার শত্রু। শেষ মুহূর্তে তার ওপরে আমি ছন্দোবদ্ধ গোলাপ ছড়াব না। শেষ নিঃশ্বাসটুকু দিয়েই ককিয়ে উঠে বলছি ঃ নিজেকে যে পাল্টায়, সেইই কেবল বিশ্বস্ত থাকে নিজের প্রতি।"

মুখোমুখি : রবিশঙ্কর

সুমন : পাশ্চাত্যে নানান দেশে, নানান শহরে আপনি কয়েক দশক ধরে অনুষ্ঠান করে চলেছেন। শিল্পীরা শুনেছি বিশেষ বিশেষ আসরে বা জায়গায় গেয়ে বাজিয়ে একটু বিশেষ ধরনের তৃপ্তি পান। আপনার কি পাশ্চাত্যে সেরকম কোনো প্রিয় দেশ বা আসর আছে?

রবিশঙ্কর : এখন খুব বেশি তফাৎ মনে হয় না। প্রায় সব জায়গাই একরকম হয়ে গেছে। তবে পুরনো দিনের কথা ভাবলে আমার সবার আগে জার্মানির কথা মনে হয় এবং আমেরিকার কথা। সব থেকে বেশি এবং সবার প্রথমে এই দুই দেশে আমাদের সঙ্গীতের আদর বলুন, প্রচার বলুন সবকিছু যতখানি আমি করতে পেরেছি আজ ৩৪ বছর হয়ে গেল, এ দু'দেশে সবার আগে শুরু করি এবং শুধু আমিই নয়, আমার দাদা উদয়শঙ্করও। ১৯৩০ থেকে '৩৭ অবধি, মানে যুদ্ধ লাগা অবধি। তখনো আমি তাঁর সঙ্গে ছিলাম। তিনিও এই দুই দেশেই সব থেকে বেশি আদর পেয়েছিলেন।

সুমন : ভারতের কোনো আসর আর পাশ্চাত্যের কোনো আসর, এই দুয়ের মধ্যে কি কোনো তফাৎ আছে?

রবিশঙ্কর : এখন আর নেই। আগে ছিল। আগে একটু বুঝে শুনে বাজাতে হত। বিশেষ করে ধরুন 'সময়', আমাদের এখানে বাজাতে হলে লোকেরা অনেকক্ষণ ধরে আলাপ শুনতে চায়। তারা আশা করে অনেকক্ষণ ধরে একটা রাগের আলাপ করব। এবং ধরুন এক ঘণ্টা-দেড় ঘণ্টা আলাপ বাজিয়ে তারপর গৎ মানে একটা জলসায় দু-তিনটে রাগ বাজিয়ে হেসে খেলে চার ঘণ্টা-সাড়ে চার ঘণ্টা হয়ে যায়। কিন্তু এখানে পুরো কনসার্ট দু-আড়াই ঘণ্টার মধ্যে শেষ করতে হয়। কারণ ওরা অভ্যস্ত নন। খুব মেরে কেটে দু'ঘণ্টা কি আড়াই ঘণ্টার বেশি ওরা বসতে পারেন না। তার মধ্যে আবার একটা ছোট ইন্টারভেলও দিতে হয়। কাজেই এই বিরতি যে আমি শুরু করি পশ্চিমের কনসার্টে, প্রথমে যার জন্য আমাকে সবাই খুব সমালোচনা করেছিল। কিন্তু এখন যদি আমি এটা না করতাম, তাহলে ভারতীয় সঙ্গীতের যে সমাদর এখন হচ্ছে, সেটা হত না। কারণ, এখন দরকার হয় না। এখন এরাও শুনতে শিখেছে, অনেকক্ষণ ধরে। লম্বা 'আলাপ' এরাও শুনতে চায়। শুধু বিপদ হয় কি জানেন? এখানে নানারকম থিয়েটার আছে, যেখানে ইউনিয়ন রেগুলেশন আছে। ওয়ার্কার্স

ইউনিয়ন আছে। তারা চায়, ধরুন আটটায় শুরু হলে সাড়ে দশটার মধ্যে শেষ করতে হবে। এগারোটার মধ্যে যেন স্টেজ ছেড়ে দেওয়া হয়। একমিনিট বেশি হলে হয়তো পাঁচহাজার মার্ক এক্সট্রা দিতে হবে। কাজেই এইসব নিয়মের মধ্যে আমাকে একটুখানি এ্যাডজাস্ট করতে হয়।

সুমন : যে ক'জন ভারতীয় শিল্পীর দৌলতে ভারতীয় মার্গসঙ্গীত পাশ্চাত্যের শ্রোতাদের কাছে ব্যাপকভাবে পৌঁছাতে পেরেছে, আপনি তাঁদের অগ্রণীদের মধ্যে একজন। কয়েক দশক ধরে আপনার এই যে উদ্যোগ, এর ফলে পাশ্চাত্যের শ্রোতারা, অন্তত যাঁরা অনুষ্ঠান শুনতে আসেন, কতটা সমঝদার শ্রোতা হয়ে উঠতে পেরেছেন বলে আপনি মনে করেন, নাকি এঁরা প্রধানত জগৎজোড়া নামের টানেই আসছেন?

রবিশঙ্কর : হয়তো খানিকটা সেটাই সত্যি। যেটা আপনি শেষের দিকে বললেন। কিন্তু এটাও ঠিক আমি এত মেহনত করেছি গত ৩৪ বছর ধরে এবং শুধু বাজনা নয়, বই লিখেছি, অনেক এরকম ইন্টারভিউ দিয়েছি। এছাড়া টি ভি প্রোগ্রাম, রেডিও প্রোগ্রাম এবং শুধু তাই নয়, নানা বিশ্ববিদ্যালয় ও মিউজিক স্কুলে নানারকম লেকচার ও ডেমনস্ট্রেশন দিয়েছি তাতে আমার পরে আরও যাঁরা শিল্পীরা এসেছেন তাঁদের শুনেছেন। এছাড়া আমাদের রেকর্ড যা বিক্রি হয় তাতে যা লেখা থাকে সঙ্গীত সম্বন্ধে সেগুলো পড়ে টড়ে, শুনে শুনে এখন আমরা দেখতে পাচ্ছি প্রায় প্রধান শহরে, ইউরোপ এবং আমেরিকায় বেশ কয়েক'শ লোক তৈরি হয়ে গেছেন যাঁরা সত্যিকারের ক্লাসিকাল মিউজিক শুনতে আসেন এবং শুনতে আসেন শুধু কিউরিওসিটির জন্য। তাঁরা শুনে আনন্দ পান এবং বুঝতে পারেন। তাঁরা আলাপ শুনতে চান। তাঁরা কঠিন তাল বা তালের গৎ শুনতে চান, হাতে তাল দিয়ে মাত্রা গুণে। কাজেই আমি দেখতে পাচ্ছি তাঁরা আগের তুলনায় এখন বেশ সমঝদার হয়েছেন।

সুমন : যদি বলি যে ভারতীয় উচ্চাঙ্গের কণ্ঠসঙ্গীত পরিচিতির দিক দিয়ে জনপ্রিয়তার দিক দিয়ে পাশ্চাত্যে পশ্চিমী দেশগুলোয় যন্ত্রসঙ্গীতের চেয়ে একটু পিছিয়ে আছে, সেটা কি ভুল হবে?

রবিশঙ্কর : মোটেই ভুল নয়। একেবারে ঠিক। সেজন্য তাদের কুণ্ঠার কোন দরকার নেই, এটা একটা স্বাভাবিক জিনিস। আমি একটা তুলনা দিচ্ছি। ধরুন ভারতবর্ষে প্রথমে তো পাশ্চাত্য সঙ্গীত খুব কম লোকেই শোনে, আবার শুনে ভালো লাগে হয়তো খুব কম লোকের। কিন্তু যাও লাগে, আপনি দেখবেন সেটা হয়তো গিটার শুনে, বা ভায়োলিন শুনে বা বাঁশী বা সিম্ফনি অর্কেস্ট্রা শুনে। তাদের যদি আপনি ভাগনারের অপেরায় নিয়ে

শোনেন বা ফাউস্টার এ, দেখবেন তারা পালিয়ে যাবে। তার কারণ, ধরুন আপনি, আমি কিংবা ওয়েস্টার্ন লোক যে কেউ যদি জাপানি কাবুকীর গান শুনি হয়তো দু'মিনিট পরে আমাদের অস্বস্তি লাগবে। এতে বোঝা যাচ্ছে যে কণ্ঠস্বর দিয়ে মানুষ যে ভাব প্রকাশ করে প্রত্যেক দেশে, বা প্রত্যেক আলাদা কালচারে, এর একটা আলাদা আওয়াজ, আলাদা ভাবে প্রকাশ এবং ভাষা এর মধ্যে একটা খুব ইম্পর্টান্ট জিনিস, নয় কি? কাজেই এটা স্বাভাবিক জিনিস। এদের গলার প্রস্তুতি আলাদা, এদের আওয়াজ প্রোডাকশন আলাদা আর আমাদের গলার আওয়াজও আলাদা, প্রত্যেকের আলাদা আওয়াজ। আমরা গাইতে গিয়ে হয়তো দশবার গলা (গলা ঝাড়ার আওয়াজ করে) খ্যাঁকারি দিচ্ছি, জল খাচ্ছি, বা তানপুরার কাছে কান নিয়ে গলা মেলাচ্ছি, এধরনের জিনিসগুলোতে এরা অভ্যস্ত নয়। কিন্তু তাও বলব ভীমসেন যোশীর মতন লোক, বা যশরাজের মতন লোক বা মল্লিকার্জুন মনসুর বা লক্ষ্মীশঙ্কর এরকম অনেককে আমি দেখেছি যাঁদের এখানে বেশ সমাদর আছে এবং তাঁদের গান হলে লোকের খুব ভাল লাগে।

সুমন : আপনার সঙ্গীত জীবনে বাংলার কীর্তন, বাউল ইত্যাদির ভূমিকা কতটা?

রবিশঙ্কর : আমি ছোটবেলায় যতখানি শুনেছি বা বড় হয়েও ভালো লোকের শুনেছি এবং বাঙালি হবার দরুন সেটা কানে লেগে আছে। এবং আমি নিজে খুব ভালোবাসি রবীন্দ্রসঙ্গীত থেকে নিয়ে যাবতীয় পুরনো ধরনের গান। এবং কখনো কখনো আমার বাজনার ভেতরে বিশেষ করে, আমি শেষের দিকে যখন বাজাই ধুন বা ঠুংরী তখন কিছু কিছু বাংলার সুর এসে যায় এবং সেটা আমার নিজের খুব ভালো লাগে।

সুমন : একসময় লক্ষ্মীশংকরের গাওয়া আপনার সুরে গান "মায়া ভরা রাতি সাথীহারা চলে যায়" বাংলা রাগাশ্রয়ী গানে একটা নতুন যুগ এনে দিয়েছিল। তারপর আপনি অতি সম্প্রতি হৈমন্তী শুক্লাকে দিয়েও কিছু গান গাইয়েছেন। এরকম ধরনের পরীক্ষামূলক কাজ কি আপনি আরো করছেন?

রবিশঙ্কর : করতে তো চাই, তবে রেকর্ড কম্পানি তো সেগুলো বিক্রি করে না, আর করে লাভ কী বলুন যদি রেকর্ডের কোনো প্রোমোশন না হয়! লোকে চায় শুনতে, কিন্তু যারা কিনতে যায় পায় না দোকানে। এই একটা অদ্ভুত ভিসিয়াস সাইকেলে আমাদের সবকিছু চলছে। এটা যদি না ইমপ্রুভ হয়, তাহলে দেশের কারো পক্ষে এক্সপেরিমেন্টাল কাজ করা বড় অসম্ভব।

সুমন : অনেকদিন ধরে আমার মনে একটা প্রশ্ন ঘুরছে, যেটা আমি অনেকদিন ধরে আপনাকে করতে চাইছি। সেটা হল মানুষ যে সঙ্গীত সৃষ্টি করে, সেই মানুষ তো সামাজিক জীব, সমাজের বিভিন্ন ঘটনা আমাদের ওপরে ছায়া ফেলে। আপনার জীবনে আপনার দেশের বিভিন্ন ঘটনা আপনার ওপরে কতটা ছায়া ফেলছে? ধরুন ভোপালে বিরাট গ্যাস দুর্ঘটনা, এটা কি আপনার সঙ্গীতে প্রভাব ফেলছে?

রবিশঙ্কর : বিদেশী সঙ্গীতে এই জিনিসটা বেশি বোঝা যায়। ধরুন, তারা একটা কিছু হলেই তার একটা সিম্ফনি মতো করে একটা নামও দিয়ে দিল। ধরুন দ্য ভোপাল ট্রাজেডি বলে একটা সিম্ফনি হল। কাজেই এটা সম্ভব তাদের মাধ্যমে, তাদের যন্ত্রের মাধ্যমে, নানা রকমভাবে তারা করতে পারে, আমি সেরকম ধরনের কিছু যদি করি তবে হয়তো পারব বা করেওছি খানিকটা। আমি মডার্নে তো করিনি, হয়তো আমি একটু পুরাতনী জিনিস নিয়ে করেছি। নানারকম কম্পোজিশন অর্কেস্ট্রা ইত্যাদি। কিন্তু সেতার বাজনার ভেতর দিয়ে যেটা প্রকাশ পায়, সেটা এতই সূক্ষ্ম যে বোঝানো যাবে না যে গ্যাস ছাড়ল বা তাতে লোক মারা গেল,। সেটা হয়তো প্রকাশ পাবে না, তবে ব্যাথাটা হয়ত পাওয়া যাবে, হয়ত সেটা যে কোনো ব্যাথার মতই শুনতে লাগবে। কিন্তু ওগুলো এত সূক্ষ্ম যে বাজনার ভেতরে, আমাদের মনের ভেতরে যা কিছু আসে, আনন্দ, ব্যথা, রোমান্স যা কিছু বলুন ভক্তিমূলক, ঈশ্বরমুখী, আধ্যাত্মিক সমস্ত ভাবনাগুলো অত্যন্ত সূক্ষ্ম। তা বোঝবার জন্য বা অনুভব করার জন্য সবরকম সূক্ষ্ম মন দরকার, প্রস্তুতির দরকার।

সুমন : আপনি একজন জীবন্ত কিংবদন্তী, লিজেন্ড। আপনি আপনার সারা জীবনের এখনও পর্যন্ত যে ইতিহাস, যে কোনো শিল্পীর মনে সেটা ঈর্ষা জাগাতে পারে কিন্তু আপনার শিল্পী জীবনে বা সঙ্গীত জীবনে কোথাও কি কোনো অপূর্ণতা বোধ আছে? ব্যর্থতা বোধ?

রবিশঙ্কর : সত্যি কথা বলতে কি, এই কথাটা আমি আমার বাবা মানে গুরুদেব আলাউদ্দিন খাঁ সাহেবকেও বলতে শুনেছি। এই ব্যাথা আমার মনে হয় সব শিল্পীরই থাকে এবং থাকা উচিতও, হয়তো। এবং সেটা হচ্ছে কি, সব করেও মনে হয় কিছুই হয়নি। মানে সব পেয়েও মনে হয় কিছুই পাইনি, সব দিয়েও মনে হয় এখনো দেওয়ার আছে, এইসব মিলিয়ে একটা ব্যর্থতা যে মনে আসে, সেটাকে অস্বীকার করি কী করে?

মুখোমুখি : হেমন্ত মুখোপাধ্যায়

সে বছরটা হেমন্ত মুখোপাধ্যায়ের সঙ্গীতশিল্পী হিসাবে ৫০ বছর পূর্ণ হ'ল। ভয়েস অফ জার্মানির বাংলা বিভাগের হয়ে আমি তাঁর শরৎ চ্যাটার্জি অ্যাভিনিউ-এর বাড়িতে বসে এক দীর্ঘ সাক্ষাৎকার নিয়েছিলাম।

বাংলা গানের ধারার পরিবর্তন, বাংলা গানের ভবিষ্যৎ, রবীন্দ্রসঙ্গীত থেকে 'অনুকরণ-সঙ্গীত' পর্যন্ত নানান বিষয়ে সেদিন তিনি শুনিয়েছিলেন নিজের খোলামেলা অভিমত। সেই সাক্ষাৎকারের বেশ কিছু অংশ এখনো সমানভাবে প্রাসঙ্গিক।

সুমন : সঙ্গীতশিল্পী হিসাবে আপনার পঞ্চাশ বছর পূর্ণ হল। এই সুদীর্ঘ শিল্পী জীবনে আপনার আদর্শ কে ছিলেন?

হেমন্ত : প্রথমেই বলে নিই — গান গাওয়া যদি ধরো তাহলে কিন্তু আমার বাহান্ন বছর হয়ে গেল। আর প্রথম রেকর্ড হওয়ার সময় যদি ধরো তাহলে এই পঞ্চাশ বছর হল। প্রথম জীবনে আমার আদর্শ ছিলেন পঙ্কজ মল্লিক, শচীনদেব বর্মন, কে. এল. সায়গল, কৃষ্ণচন্দ্র দে, সন্তোষ সেনগুপ্ত। সন্তোষদা অবশ্য অত সিনিয়র নন। আমরা যখন স্কুলে পড়তাম, এঁদের গান শুনতাম আর এঁদেরই গান গাইতাম। পরেও এঁরাই আমার আদর্শ থেকে গিয়েছেন।

সুমন : আপনার ছেলেবেলা কি কলকাতাতেই কেটেছে?

হেমন্ত : ছেলেবেলায় ন'বছর পর্যন্ত আমার দেশে, বহড়ু চব্বিশ পরগণা, জয়নগর, মজিলপুর তার আগে। কলকাতায় আসি কোন সালে সেটা ঠিক মনে নেই। ওই আট-ন'বছর বয়সে এসেছি।

সুমন : কারও কাছে আপনি কি গান শিখেছেন, সেভাবে?

হেমন্ত : সেভাবে গান শেখা হয়নি আমার। গান শিখেছি শুনে শুনে। আর ফণী গাঙ্গুলি বলে এক ভদ্রলোক ছিলেন, তিনি রেলওয়েতে কাজ করতেন। কিন্তু ফৈয়াজ খাঁর ছাত্র ছিলেন। তাঁর কাছে বোধহয় বছর দেড়েক গান শিখেছিলাম। তারপর ভদ্রলোক হঠাৎ মারা গেলেন। তারপরে এই মার্গসঙ্গীত শেখা আর হয়নি।

সুমন : আপনার দীর্ঘ সঙ্গীতশিল্পী জীবনে নিশ্চয়ই বাংলা গানের ধারার বেশ কিছু পরিবর্তন দেখেছেন। খুব সংক্ষেপে আপনি কি কিছু মন্তব্য করতে পারেন, এই পরিবর্তন সম্পর্কে?

হেমন্ত : পরিবর্তন সম্পর্কে মন্তব্য করতে পারি এইভাবে, যে আমরা যখন গান শুরু করি, তখন গানের সঙ্গে একটা আনন্দ ছিল, আনন্দ পেতাম গান করে এবং তখন এই প্রফেশনাল ব্যাপারটা এত ছিল না আর যাঁদের গান আমরা

শুনতাম, এই সায়গল, পঙ্কজ মল্লিক, কে. সি. দে, শচীন দেব বর্মন, এঁদের আগে ঘরোয়া আসরও অনেক হত। সে সময়ে inspired হতাম তাঁদের গান শুনে, তারপরে আস্তে আস্তে film টা dominate করতে আরম্ভ করল। মানুষের গানে film যখন এল, তবু বাংলা film ঠিক ছিল, কিন্তু যখন হিন্দি film-এর craze টা এসে গেল, আর জনসংখ্যা বাড়তে আরম্ভ করল হু-হু করে, এসব জায়গায় যেখানে বসে আছি মাঠ ছিল, জঙ্গল ছিল। টালিগঞ্জে আমি যখন studio-তে কাজ করি East India Company-তে, তখন ডাকাতি হত। ঐ Tram Depot থেকে নেমে হেঁটে..... তখন Bus Service ছিল একঘণ্টা-দেড়ঘণ্টা অন্তর। তখন আমি রোজ Tram Depot থেকে নেমে হেঁটে যেতাম East India Studio-তে, তা লোকসংখ্যা এত কম, এত শান্তির জায়গা ছিল সব জায়গাই প্রায়। এখন তো অশান্তি। বাড়ি থেকে বেরোতে পারি না, বেরোতে ইচ্ছে করে না। গেলেই এই Tram-Bus এই যানজট, মানুষকে একেবারে বিভ্রান্ত করে দেয়। সেজন্য আমাকে অনেকে বলেন যে পুরনো গান সকলে পছন্দ করছে, কিন্তু নতুন গান শুনতে চাইছে না কেন? আমি বলি নতুন গান শোনার তাদের সময় নেই, একমাত্র film এর গান ছাড়া, ঐ film দেখে film এর গান শোনে ওই পর্যন্ত। কারণ সে সময় কোথায়? মানুষ এত বিপর্যস্ত জীবনধারণে, চতুর্দিক থেকে যে তারা যেটা শুনেছে সেটা শুনতে চাইছে, আর এখন যেটা শুনছে ওই film দেখছে, film দেখে যেটা ভাল লাগছে কিছুদিন গুনগুন করছে, তারপর ভুলে যাচ্ছে।

সুমন : কিন্তু ধরুন আমার যে আগের প্রশ্নটা ছিল, পরিবর্তন, বেশ কিছু পরিবর্তন তো হয়ে চলেছে। মনে করুন আপনি যখন প্রথমে গান শুরু করেছেন "কথা কয়ো নাকো শুধু শোনো", তারপর সলিল চৌধুরী পর্ব। তারপরে আপনার নিজের সুর — এসব মিলিয়ে আপনি কি কোনো পরিবর্তনের একটা পথ দেখতে পেয়েছেন?

হেমন্ত : পথ আমি এখনও পাইনি। পরিবর্তন হচ্ছে এই পর্যন্ত দেখছি চোখের সামনে। পরিবর্তনটা হচ্ছে, এই slow গান লোকে পছন্দ করছে না, ঢিমে গান পছন্দ করছে না। এই যে সব বিদেশী কতগুলো যন্ত্র এসেছে, সেগুলো ঢুকে গেছে Orchestraর মধ্যে। যেই Orchestra আমার পছন্দ হয় না। ওদের আমার violin ভীষণ ভালো লাগে, গিটার, violin, Piano ইত্যাদি দিলে যে সুন্দর রসের সৃষ্টি হয়, এই electronics-এ কিন্তু সেগুলো হচ্ছে না, এই জগঝম্প, কেবল আওয়াজ আর rhythm আর rhythm, এই rhythmটা ঢুকিয়েছে, নাচটা ঢুকিয়েছে। young generation তারা গানের সঙ্গে নাচতে আরম্ভ করে। সেরকম গান চায়, তা না হলে পছন্দ হয় না।

সুমন : আজকাল অনেকেই বলছেন, শুনতে পাই, যে আধুনিক বাংলা গানের যুগ নাকি শেষ হয়ে গিয়েছে। এটা কি বলা চলে?

হেমন্ত : কী জানি। বলা চলে না বোধহয়। আধুনিক যুগ থাকবে। আজকের যেটা সেটাই তো আধুনিক। এখন এর মধ্যে যদি কেউ বেরিয়ে যায়, যেতেও তো পারে। তবে আমার নিজের ক্ষেত্রে আমি আর আধুনিক গান করছি না। যেটুকু করি, রবীন্দ্রনাথের গানই করি।

সুমন : রবীন্দ্রনাথের গান কি আধুনিক গান নয়?

হেমন্ত : নিশ্চয়ই আধুনিক। রবীন্দ্রনাথ তো বেশি আধুনিক। তিনি আজ পঞ্চাশ, ষাট, সত্তর বা তারও আগে যেসব গান করে গেছেন, সেগুলো তো আজকে আধুনিক বলেই মনে হচ্ছে। কত মডার্ন সেগুলো।

সুমন : বাংলা আধুনিক গানের ভবিষ্যত কী? আপনি কী মনে করেন?

হেমন্ত : এ ভাই বলা বড় শক্ত। ভবিষ্যৎ যে কী তা আমি বলতে পারব না, কোথায় গিয়ে দাঁড়াব আমরা জানি না, তবে এটুকু জানি যে রবীন্দ্রসঙ্গীত আমাদের থাকবে, এটা যাবে না। এবং এই যে ভাবছেন অনেকে যে ১৯৯০ সালের পরে এই রবীন্দ্রসঙ্গীত একেবারে অনেকে যা তা করে গান করবে, তা হবে না। সেভাবে গান করলে কেউ শুনবে না। যে ধারা রবীন্দ্রনাথ দিয়ে গেছেন, যে সুরের ধারা, সেটা একটু অদল-বদল হয়তো হবে, কিন্তু সেই কাঠামোটা ঠিকই থাকবে।

সুমন : সলিল চৌধুরীর গান সম্বন্ধে আপনার মন্তব্য?

হেমন্ত : সলিল চৌধুরী সম্বন্ধে আমি বলি, ও অসাধারণ সুরশিল্পী। ওর মধ্যে একটা অরিজিন্যালিটি আছে। অরিজিন্যালিটি বলতে অন্যের সঙ্গে তফাৎ। এবং ওর লেখা বা সুর, আমি তো পরপর অনেক গান করিয়েছি। এবং প্রত্যেকটা গান লোকের ভালো লেগেছে। কবেকার সেই গাঁয়ের বধূ, রানার এখনো লোকে শুনতে চায়। আমার পাল্কী চলে, এমনকি বাচ্চা বাচ্চা ছেলেরা পর্য্যন্ত 'পাল্কী চলে', 'পাল্কী চলে' বলে চেঁচায়। সে তো কত বছর আগের গান, সেগুলো তো এখনো আধুনিক হয়ে আছে।

সুমন : গ্রামোফোন কম্পানির একজন কর্তাকে একবার বলতে শুনেছি যে সলিল চৌধুরীর গান হেমন্ত মুখোপাধ্যায় বা লতা মঙ্গেশকরের মতন শিল্পীরা গেয়েছিলেন বলেই এত জনপ্রিয়। আপনি কি তা মনে করেন?

হেমন্ত : না, আমি তা ঠিক মনে করি না। নিশ্চয়ই আরো কেউ গাইতে পারলে জনপ্রিয় হত। আমরা ভালো করে গাইতে পেরেছি। সলিলের সুরের যে কাঠামো, যেটা করা উচিত সেটা করতে পেরেছি। সেইজন্য জনপ্রিয় হয়েছে।

সুমন : আপনি নিজে কী ধরনের কাজ এখন করছেন, সুর দিচ্ছেন।

হেমন্ত : আমি সুর বিশেষ দিচ্ছি না। এই তরুণ মজুমদার আমাকে ছাড়েন না, মানে তরুণ মজুমদার director, উনি আমাকে ছাড়া কিছুতেই

কাজ করবেন না। আমার শরীরেও পোষায় না এখন, তাও করতে হচ্ছে। এই তো একটা মিউজিক্যাল ছবি হচ্ছে। অনেক গান, সেটা করছি আর দুটো একটা এমনি এমনি ছবি করি। কম।

সুমন : সমকালীন কোনো শিল্পীর মধ্যে আপনি প্রতিশ্রুতি দেখতে পাচ্ছেন?

হেমন্ত : সমকালীন শিল্পীদের মধ্যে অনেকেই, মেয়েরা এত বেশি এগিয়েছে, তারা গানের চর্চা করে। ছেলেদের মধ্যে কম।

সুমন : বাংলা আধুনিক গানের ভবিষ্যতের জন্যে আপনি ব্যক্তিগত ভাবে কিছু করছেন কি?

হেমন্ত : কিচ্ছু না। মানে কী করব আমি নিজেই জানি না। আমার কিছু করার নেই। আমি যা কাজ করছি, সেইটাই আমার কাজ।

সুমন : কাউকে কি শেখাচ্ছেন?

হেমন্ত : না, শেখাচ্ছি না। তবে আমার ধরনের গান অনেকে করে। ধরুন তাদের মধ্যে দু'এক জন আসে, তাদের আমি গাইয়েওছি ছবিতে। তারা সাকসেসফুল। তাদের যথেষ্ট নামও হয়েছে।

সুমন : কিন্তু অনুকরণ, আপনার অনুকরণ করে তো শিল্পী জন্মাবে না।

হেমন্ত : না, তা হবে না, আমি যেমন অনুকরণ করেই আরম্ভ করেছিলাম, পঙ্কজ মল্লিকের। কিন্তু আমি নিজে বুঝতে পারলাম, যে এটা বদলানো দরকার। আমি নিজে বদলেছি। আস্তে আস্তে আমার উচ্চারণ, আমার স্টাইল, আমি নিজে তৈরি করেছি। এখন ধরো, যদি সেরকম কিছু হয়, আমি নিজে বুঝতে পারি, কোথায় গোলমালটা হচ্ছে। গোলমালটা হচ্ছে, যে বড্ড বেশি অনুকরণ করছে। কেউ মহঃ রফি, কেউ মান্না দে, কেউ হেমন্ত মুখার্জি, কেউ অমুক-তমুক এই.....। আমি নিজে দেখেছি, কোনো কোনো ছবিতে তাদেরকেই গান গাওয়াবার জন্য ডেকে আনা হচ্ছে। এখন নতুন গানের ক্ষেত্রে হচ্ছে কি, এরা অন্যের গান গাইছে খুব সুন্দর, যেমন লতা মঙ্গেশকরের গান, বা মহঃ রফির গান গাইল, বেশ ভালো গাইল। কিন্তু যেই একটা নতুন গান পেল, সে আর গাইতে পারছে না। তার কারণ হচ্ছে কী জানো, সেই যে শিল্পীর যে contribution, শিল্পীর যে সত্ত্বা তার নিজের যে কী আছে, কিচ্ছু জানে না সে। এবং সেটা express করতে পারে না। নতুন গানে যদি তার নিজের contribution না থাকে, তো সে গান ভালো হয় না। reject করতে হয়।

সুমন : আমরা তো ছোটবেলা থেকেই দেখছি, আপনি বরেণ্য শিল্পী। আপনার নামে টিকিট বিক্রি হয়েছে। আপনি এলে ভিড় জমে গেছে। কিন্তু আপনার জীবনে কি কোনো ব্যর্থতা আছে, সঙ্গীতশিল্পী হিসেবে?

হেমন্ত : আমার নিজের জীবনে কোনো ব্যর্থতা নেই। মানে ব্যর্থতা নেই এই জন্যেই যে, আমি যে কোনো কাজ আরম্ভ করি, বা ধরি, আমি আগে থেকেই ভেবে নিই যে আমি ব্যর্থ হব। সেই জন্য আমার ব্যর্থতা নেই।

কহেন কবি কোহেন

সে প্রায় চল্লিশ বছর আগের কথা। ক্যানাডার মন্ট্রিয়ল শহরে তখন লেনার্ড কোহেনের কৈশোর। তাঁর বাবার এক বন্ধু লেনার্ডকে গিটার বাজাতে শেখালেন। ভদ্রলোক ট্রেড ইউনিয়ন করতেন। অনেক পরে, লেনার্ড কোহেন স্মৃতিচারণ করেছেন : "সেকালে শুধু সোশালিস্ট আর কমিউনিস্টরাই গিটার বাজাতেন।"

ইহুদি পরিবারের সন্তান লেনার্ড কোহেন। প্রথম বিশ্বযুদ্ধের পর উত্তর আমেরিকায় যে র‍্যাডিকাল ও বামপন্থী আন্দোলন দানা বেঁধে উঠেছিল, এবং দ্বিতীয় বিশ্বযুদ্ধের আগে যা কিনা উঠেছিল তুঙ্গে, ইহুদিরাই ছিলেন তার সামনের সারিতে। র‍্যাডিকাল চিন্তাভাবনা লেনার্ড কোহেনের একরকম উত্তরাধিকারসূত্রেই পাওয়া। সেই সঙ্গে হাত মেলাল গিটার। ক্যানাডার ম্যাক্‌গিল বিশ্ববিদ্যালয়ে সাহিত্য নিয়ে লেখাপড়ার সময়ে তিনি এক স্থানীয় ব্যান্‌ডে বাজাতে শুরু করলেন। আর শুরু করলেন পদ্য লেখা। তাঁর লেখা কবিতার প্রথম সংকলনটি যখন বেরলো, তখনো তিনি ছাত্র। ১৯৫৭ সালে লেনার্ড কোহেন নিউ ইয়র্কের এক আসরে কবিতা পড়তে এলেন। খালি গলায় পড়লেন না কিন্তু। কবিতা পাঠ করলেন তিনি এক জ্যাজপিয়ানো শিল্পীর সঙ্গতে।

"এ শহরে ক'জনের ঘরে
আসবাব আছে তাই ভাবি
বহু রাত্তিরে
প্রকাণ্ড বাড়িগুলো দেখি
প্রতি জানলার থেকে দেখে নেয় এক-একটা মুখ
আমার চেহারা
ফিরে যেতে যেতে আমি ভাবি
ক'জন ফিরছে তার লেখার টেবিলে
এই কথাগুলো লিখে নিতে।"

১৯৬১-তে বেরোনো কোহেনের কবিতা-সংকলন "পৃথিবীর মশলার কৌটো" থেকে এ-কবিতা নেওয়া। কোহেনের মশলায় ততদিনে মজেছেন ক্যানাডার সাহিত্যপাঠক। '৬৩ ও '৬৬-তে তাঁর দুটো উপন্যাস বেরনোর পর লেনার্ড কোহেন ক্যানাডার সাহিত্যিক-সমাজে পাকাপাকি প্রতিষ্ঠা পেয়ে গেলেন। এ-সময়ে তাঁর আর একবার ডাক পড়ল নিউ ইয়র্কে কবিতা পাঠের আসরে। সেখানেই একদিন এক গানের জলসায় ঢুকে

পড়ে তিনি টের পেলেন এক নতুন প্রজন্মের গায়ক-গায়িকারা আধুনিক গানের ভাষাটাকেই পাল্টে দিয়েছেন। ভাষা নিয়ে কোহেনেরও কারবার। সুর নিয়েও। কবিতা ও উপন্যাস লেখার ফাঁকে ফাঁকে গান তিনি লিখে গিয়েছেন অনেক দিন আগে থেকেই। কিন্তু গান যে তার প্রধান মাধ্যম হতে পারে, তাঁর সময়টাকে যে গান দিয়েও মোক্ষম ধরা যেতে পারে, এটা তিনি আগে ভেবে দেখেননি তলিয়ে।

মার্কিন যুক্তরাষ্ট্রে তখন ঝোড়ো হাওয়ার যুগ। একদিকে কৃষ্ণাঙ্গদের নাগরিক অধিকার আন্দোলন। অপরদিকে বিশ্ববিদ্যালয়গুলোতেও উথলে উঠেছে তখন ছাত্রসমাজের নবজাগরণ। ভিয়েতনাম যুদ্ধের বিরুদ্ধে আমেরিকার তরুণ-সমাজ তখন বিদ্রোহ করছেন। বিদ্রোহ করছেন তাঁরা সনাতন মার্কিনি সমাজ-ব্যবস্থা, বর্ণবাদ, যুদ্ধবাদ ও জড়বাদের বিরুদ্ধে। প্রত্যাখ্যান করছেন তাঁরা মার্কিনি মূল্যবোধ ও মতবাদ। প্রতিবাদের গন্ধ তখন উত্তর আমেরিকার সর্বাঙ্গে। সেই প্রতিবাদ ও জাগরণের ধাক্কা লেগেছে গানবাজনাতেও। প্রতিটি জনসমাবেশে, বিক্ষোভে সামনের সারিতে চলে এসেছেন গায়ক-গায়িকারা। এক নতুন প্রজন্মের শিল্পীরা এসে পড়েছেন পুরোভাগে। তাঁরা প্রায় সকলেই তরুণ-তরুণী। লিখছেন নতুন নতুন গান। তাঁদের লিরিকে ভাষা পাচ্ছে যুগের দাবি, শোষণমুক্তি, দমনমুক্তির দাবি, শান্তির দাবি, যুদ্ধ থামানোর দাবি, মানবতার দাবি, জীবনের দাবি। ভাষা পাচ্ছে প্রতিবাদ, বিদ্রোহ সমালোচনা, ধিক্কার, সেই সঙ্গে মৈত্রী, সংহতি, ভালোবাসা। সে-গানের সুর সহজ সরল, লোকে যাতে বেশী কসরৎ না করেও গাইতে পারে। সে-হল নতুন "লোকগীতির" আন্দোলন। ষাটের দশকে এই আন্দোলনের সামনের দিকে দেখা যাচ্ছিল এক ক্ষীণকায়, তীক্ষ্ণকণ্ঠী গায়ক-কবিকে। আসল নাম রবার্ট জিমারম্যান। লোকে তাঁকে চিনল 'বব ডিলান' নামে। তাঁর লেখা শান্তি গান 'ব্লোয়িং ইন দ্য উইন্ড' তখন একটা গোটা প্রজন্মের গান হয়ে উঠেছে। অদৃশ্য সংকেতের মতো ভেসে চলছে সেই গান মানুষের মুখ থেকে পৃথিবীর দিকে দিকে।

প্রতিবেশী দেশ ক্যানাডার কবি লেনার্ড কোহেনও পেয়ে গেলেন সংকেত। ছাত্র আন্দোলন তখন, মার্কিন যুক্তরাষ্ট্রের মতো ক্যানাডাতেও চলছিল। যুগের গতিবেগে কোহেন তাই এমনিতেই শরিক। নতুন লোকগীতির আন্দোলন শুধু তাঁকে নতুন করে জাগিয়ে দিল। ডিলানের চেয়ে একটু বেশী বয়সেই নতুন ধারায় গান লিখতে ও গাইতে শুরু করলেন লেনার্ড কোহেন।

প্রতিবাদী গানের আন্দোলন তাঁর সততা ও বলিষ্ঠতা সত্ত্বেও ষাটের দশকে একধরনের ফ্যাশনও হয়ে দাঁড়িয়েছিল। বড় বড় রেকর্ড কম্পানি

এই নতুন "লোকগীতি"র বিপুল জনপ্রিয়তার মধ্যে খুঁজে পেয়ে গেলেন মুনাফার নতুন রাস্তা। অজস্র গীতিকার-গায়ক (পাশ্চাত্যে অধিকাংশ কণ্ঠশিল্পী নিজেরাই গান লেখেন) তখন এই নতুন আঙ্গিকে বেধড়ক গান লিখে চলেছেন। তাতে সৎ উচ্চারণের তাগিদের চেয়ে রাতারাতি নাম করে যাওয়া, 'বব ডিলান' হয়ে যাওয়ার তাগিদটাই বেশি ছিল। ফলে দেখা দিল নকল করার প্রবণতা, আঙ্গিকসর্বস্বতা এবং অতি দুর্বল ও একঘেয়ে লিরিক। শুধু 'প্রতিবাদ' ও 'বিক্ষোভ' ভাঙিয়ে, কিছু গরম-গরম আপ্তবাক্য ক্রমাগত একঘেয়ে ভঙ্গিতে লিখে গেলে এবং কল্পনার অভাব থাকলে অবস্থাটা যে কী দাঁড়ায়, বাংলার বেশকিছু তথাকথিত "গণসংগীত" তার প্রমাণ। ষাটের দশকে উত্তর আমেরিকার "লোকগীতি" আঙ্গিকটিরও কতকটা একই দশা হয়েছিল।

এ-হেন কুমিরছানা-দেখানোয় লেনার্ড কোহেনের মতো কবি-গীতিকারের স্পৃহা থাকার কথা নয়। তিনি যখন নতুন উৎসাহে গান লেখা শুরু করলেন। তাঁর লিরিকে ধরা দিল নতুন বিষয়, নতুন ভাবনা। কবি হিসেবে ভাষার একটা নিজস্ব আঙ্গিক তিনি আগেই গড়ে নিয়েছিলেন। সেটিকেই প্রয়োগ করলেন তিনি এবার তাঁর গানে। গায়ক হিসেবে নয়, প্রথমে গীতিকার-সুরকার হিসেবেই অধুনিক গানের দুনিয়ায় ও বাজারে ঠাঁই পেলেন লেনার্ড কোহেন। ১৯৬৭ সালে জুডি কলিনস কোহেনের লেখা 'সুজ্যান' গানটি রেকর্ড করলেন। সেই একই বছর একই গান আবার রেকর্ড করলেন রেক্স হ্যারিসনের ছেলে, কণ্ঠশিল্পী নোয়েল হ্যারিসন। বলতে গেলে একটা নতুন যুগের সূচনা ঘটাল এই 'সুজ্যান'। সমাজের প্রান্তবাসিনী এক অদ্ভুত, আধপাগল মেয়েকে নিয়ে লেখা এই দীর্ঘ, অনুচ্চ গান বলে দেয় এ-সমাজের মূলস্রোত ও তার মূল্যবোধগুলিকে লেনার্ড কোহেন প্রত্যাখ্যানই করেছেন। শুধু, এই প্রত্যাখ্যানের পরতে পরতে রয়েছে এক বিকল্প জীবনবোধের স্বীকৃতি, জীবন ও মানুষের প্রতি গভীর ভালোবাসা। বস্তু বা কোনো 'ব্যবস্থার' ওপরে নয়, মানুষের অন্তরাত্মার ওপর নির্ভরশীলতা। যে সমাজ, যে কাল, যে বাহ্যিক জীবনের প্রায় সবটা জুড়েই রয়েছে শুধু অপচয়, ভণ্ডামী, প্রতারণা ও অপূর্ণতা সেই সমাজ-কাল-জীবনকে প্রত্যাখ্যান করে প্রান্তবাসী এক মানুষের কাছেই যেন যেতে হবে মানুষকে জীবনের অর্থের সন্ধানে। 'সুজ্যান' একই সঙ্গে প্রত্যাখ্যান এবং বিকল্প-সন্ধান ও প্রাপ্তির গান।

"Suzanne takes you down to her place near the river. You can hear the boats go by, you can spend the night beside her. And though you know she's half-crazy, that's

why you wanna be there; she feeds you tea and oranges that come all the way from China. And then when you mean to tell her you have no love to give her, she gets you on her wavelength and lets the river answer that you have always been her lover. And you want to travel with her, and you want to travel blind. And you know you can trust her, for she touched your perfect body with her mind."

প্রায় গদ্যের ধাঁচে লেখা কোহেনের এই গান তার বিষয়বস্তুর ভিন্নতা ও গভীরতা এবং সম্পূর্ণ নিজস্ব আঙ্গিক দিয়ে এমন এক মাত্রা এনে দিল যা পাশ্চাত্যের আধুনিক গানে আগে ছিল না বলা চলে। গানের সুরেও একেবারে নতুন মাত্রা এনে দিলেন কোহেন। তাঁর ভাবনা এত প্রাচুর্য ও ব্যাপ্তি, তাঁর ভাষা এত ধ্বনিময় যে সুর আপনা থেকেই টানটান ও সংহত হয়ে এসেছে।

১৯৬৭ সালেই লেনার্ড কোহেনের ডাক পড়ল। 'নিউপোর্ট ফোক ফেস্টিভালে' স্বরচিত গান গাওয়ার জন্য। বড়দিনে বেরল তাঁর গাওয়া প্রথম রেকর্ড; 'সংস অফ লেনার্ড কোহেন'। বব ডিলানের বিপুল ক্ষমতায় আচ্ছন্ন ষাটের দশক ফুরতে চলল কোহেনের গানের স্বকীয়তার স্পর্শে। একই যুগের দুই কবি-গীতিকার, কিন্তু কত ফারাক। ডিলান প্রগলভ, তীক্ষ্ণ বেপরোয়া সরব। কোহেনের গান স্বগতোক্তির মতো, জটিল, তাতে ভাবনার গিঁট ঢের বেশি। ডিলান ও কোহেন একই যুগের দুই মেরু। ষাটের পর থেকে আজ পর্যন্ত পাশ্চাত্যের সিরিয়াস গীতিকাররা এই দুই মেরুর মধ্যেই চলাফেরা করছেন মোটামুটি।

কোহেনের কথা ডিলান, — যাঁর আত্মসর্বস্বতা ও ঔদ্ধত্য প্রবাসের মতো, — কোথাও উল্লেখ করছেন কিনা জানা মুশকিল। কোহেন কিন্তু ডিলানকে স্মরণ করতে ভোলেননি। ডিলান তাঁর চেয়ে বয়সে ছোট। কিন্তু ডিলানের রচনা ও গানই ছিল কোহেনের প্রেরণা। তাছাড়া, কোহেন যখন তাঁর গিটারখানি হাতে মৃদু পায়ে হয়তো কিছুটা সংকোচের সঙ্গেই আধুনিক গানের মঞ্চে এলেন, সারা উত্তর আমেরিকা ও ইউরোপ তখন ডিলানময়। '৭২ সালে প্রকাশিত লেনার্ড কোহেনের কবিতা-সংকলন 'দি এনার্জি অফ স্লেভ্‌স'-এ পাওয়া যাচ্ছে :

"পুরনো হলুদ রোদ্দুর ভেদ করে হেঁটে যাই
রান্নাঘরের টেবিলে নিজেকে নিয়ে লেখা কবিতার দিকে
পড়ে আছে বইজঙ্গলে আমার নাম
মৃত আর আগামী ডিলানদের তালিকায়।"

কবিতা লেনার্ড কোহেনের আকৈশোর সহচর, তাঁর অনেককালের হাতিয়ার, গানের চেয়ে কবিতা তিনি বেশি লিখেছেন। এমনকি তাঁর কবিতা ও গান পাশাপাশি রেখে পড়লে মনে হতে পারে যে গানে তিনি যা বলে উঠতে পারেননি তা তিনি বলতে চেয়েছেন কবিতায়। অথবা তাঁর কবিতা ও গান পরস্পরের সম্পূরক। ডিলানের যুগে গান, এমনকি কবিতা লিখতে গিয়েও যে স্বাভাবিক সংকোচ ও দ্বিধা কোনো মাঝারি কবি-গীতিকারের মনে গজাতে পারে, বড়মাপের গীতিকার হয়েও কোহেন তার স্বাক্ষর রেখেছেন তাঁর কবিতায়, যেখানে তিনি সত্তরের গোড়ায় বেশী অন্তরঙ্গ। এটা নিছক কপট বিনয় নয়। বরং, নিজেকে 'আলাদা' না ভেবে, ডিলানের তালিকায় নিজেকে দেখতে পাওয়ার এই যে দৃষ্টিভঙ্গি, এটাই কোহেনের নিজস্ব। নতুন গানের ধারাবাহিকতার শরিক তিনি। এই ধারাবাহিকতায় তিনি বিশ্বাসী, নয়তো "আগামী" কথাটি লিখতেন না। '৭২-এর এই কবিতায় লেনার্ড কোহেন কবি ও গীতিকার হিসেবে নিজের অবস্থানটিকে নির্মোহ হয়ে ধরতে চেয়েছেন ইতিহাসের পরম্পরার ভিত্তিতে।

'৬৭ থেকে '৭২ — এই পাঁচ বছরে ইংরিজি আধুনিক গানের ইতিহাসে অনেক পরিবর্তন ঘটে গিয়েছে। বব ডিলান তাঁর প্রতিবাদের পালা চুকিয়ে চলে গিয়েছেন নেপথ্যে। হঠাৎ গা ঢাকা দিয়েছেন তিনি। আন্দোলনের পথ ছেড়ে দেওয়া, সহগামীদের ছেড়ে চলে যাওয়া বব ডিলানকে নিয়ে খেদ করে বান্ধবী জোন বায়েজ নিজেই গান লিখে ফেলেছেন "টু ববি"। ববির প্রতি :

"ফিরে আয় ববি,
এই রাত তোরই জন্য কাঁদছে।"

সে-মুহূর্তে নতুন গানের আন্দোলন ছেড়ে ডিলানের প্রস্থান প্রায় রাত নেমে আসারই শামিল ছিল। 'ববি' তখন ম্যালিবুতে তাঁর বিলাসবহুল প্রাসাদে বসে আয়েস করছেন। এর প্রায় দেড় দশক পরে পল রোবসনের একদা-সতীর্থ এবং 'কালো মানুষের বোঝা' বইটির লেখক বৃদ্ধ জন কলিন্‌স আমায় দুঃখ করে বলেছেন : "ববডিলান আমাদের আন্দোলনগুলোকে ব্যবহার করেছিলেন নিজের স্বার্থে।"

'৬৭ থেকে '৭২-এর মধ্যে লেনার্ড কোহেনের আরো নাম হয়েছে। সত্যি বলতে, ডিলান গা ঢাকা দেবার পর কবি-গীতিকারদের মধ্যে তখন আর এমন কেউ নেই যিনি কোহেনের প্রতিদ্বন্দ্বী হয়ে উঠতে পারেন। শ্রোতারা তাই তাকিয়ে আছেন অনেক প্রত্যাশা আর মুগ্ধতা নিয়ে কোহেনেরই দিকে। কোহেনও দেখছেন নিজেকে। কিন্তু তাঁর দৃষ্টিতে না আছে মুগ্ধতা, না আছে মোহ : '৭২-এরই একটি কবিতায় :

"বুঝতেই পারছেন আমার তাড়া নেই। রোদ্দুরটা
পুরনো হলুদ। আমার প্রতিভা নামে যাচ্ছেতাই ছোট্টো ল্যাবরেটরিতে
সে-আলোই জ্বাল দিয়ে চলেছি, বহু খেটেখুটে
ছোট্টো এক ফোঁটার তাগিদে।"

কোহেনের "প্রতিভা নামে যাচ্ছেতাই ছোট্টো ল্যাবরেটরি" থেকে বেরোনো গানগুলো কিন্তু ততদিনে কোহেন ছাড়াও নামী নামী সব শিল্পী রেকর্ড করেছেন। গাইছেন আমেরিকার জোন বায়েজ, গাইছেন ইস্রায়েলের এস্থার ওফারিম।

লক্ষণীয় হল, কোহেনের যেসব গান সত্তর দশকটাকে চিহ্নিত করছে সেগুলো অনুচ্চ স্বগতোক্তির মতো, প্রেমের গান। তার বক্তব্য অবশ্য জটিল, গভীর। ষাটের উতরোল বেশ কিছুটা থিতিয়ে পড়ার পর মাঝ-সত্তরের উত্তর আমেরিকায় তখন বোধ হয় একটু আত্মস্থ হবার যুগ। এক দশক আগেকার প্রতিবাদী প্রজন্ম তখন বিভক্ত। একদল ভেবে পাচ্ছেন না কী করা উচিত। অন্য দল খুব ভালোমতোই ভেবে পেয়েছেন কী করবেন। তাঁরা আখের গোছাচ্ছেন। পাশ্চাত্যের আধুনিক গানের মঞ্চ তখন প্রস্তুত হচ্ছে নৃত্যপ্রধান বিনোদনী গানের জন্য। প্রাসঙ্গিক গান, ভাবিয়ে তোলার গান ও বাজনায় তখনো একাগ্রভাবে লেগে আছেন Pink Floyd গোষ্ঠী, যাঁরা চিরপ্রতিবাদী ও প্রতিষ্ঠান বিরোধী হয়েও কোনোদিন কোনো আন্দোলনে নেতৃত্ব দিতে চাননি, বরং একটু আড়ালেই থেকে গিয়েছেন। আর ভাবিয়ে তুলতে চাইছেন লেনার্ড কোহেন। কিন্তু তাঁর প্রতিষ্ঠানবিরোধিতা বরাবরই একটু নেপথ্যচারী। তাঁর গান তখনো স্বগতোক্তির মত। ঝোড়ো-দশকের প্রতিবাদীদের প্রথম সারিতে গিটার-হাতে কোহেনকে তেমন দেখা যায়নি। কিন্তু মার্কামারা প্রতিবাদীরা প্রতিষ্ঠান হয়ে ওঠার পর, মায় পিছিয়ে যাবার পর সত্তর দশকেই কোহেনের কবিতায় ফুঁসে উঠেছে প্রতিবাদ, আমুল প্রত্যাখ্যান:

"আমাদের বাদ দিয়ে যে-ব্যবস্থাই বানাও না কেন, ভেঙে দেওয়া হবে। আমরা তো আগেই বলেছি : সাবধান, তোমাদের নির্মাণ কিছুই থাকেনি। নকশার ওপরে হুমড়ি খেয়ে ভাবো, আর একবার শুনে নাও ঃ আমাদের বাদ দিয়ে যে-ব্যবস্থাই বানাও না কেন, ভেঙে দেওয়া হবে। ড্রাগ, বন্দুক, পিরামিড আর পেন্টাগন — এ তো তোমাদেরই। তোমাদেরই গাঁজা আর বুলেট। ওসবে আমাদের মারতে পারবে না। আমাদের কথা বলে বেড়াই না আমরা। আমাদের যা কিছু গোপন তার

এটুকুই শুধু ফাঁস করে দিচ্ছি এখন — এই হুঁশিয়ারি : তোমাদের নির্মাণ কিছুই থাকেনি। আমাদের বাদ দিয়ে যে-ব্যবস্থাই বানাওনা কেন, ভেঙে দেওয়া হবে।"

গানে স্বগতোক্তির ভঙ্গিতে হলেও কবিতায় কিন্তু সরবে, সোজাসুজি লড়াই-এর রেখা টেনে দিয়েছেন লেনার্ড কোহেন সত্তরেই। দ্ব্যর্থহীন ভাষায় চিহ্নিত করছেন বিরোধটাকে, এবং বিরোধীদের। কে শত্রু, কে মিত্র — এই হিসেবে কবি কোহেনের তখন আর কোনো দ্বিধা নেই, জড়তা নেই। তিনি যে কাদের বিরুদ্ধে এবং তাঁর শক্তির উৎসটা যে কোথায়, তা তিনি জানিয়ে দিচ্ছেন সরাসরি।

ঠিক একইরকম সরাসরি, নিঃসংকোচে তারপর জানিয়ে দিয়েছেন ষাটের বিদ্রোহী বব ডিলান বর্তমানে তিনি কাদের দলে। এককালে যাঁর গান প্রতিষ্ঠান বিরোধিতায় জ্বলজ্বলে ছিল, সাধারণ পোশাক পরে, এলোমেলো চুল নিয়ে যিনি একটি গিটার হাতে মঞ্চে উঠতেন, সেই বব ডিলান ইতিমধ্যে নবজন্ম নিয়েছেন। হঠাৎ করে ধর্মীয় প্রতিক্রিয়াশীলতায় নতুন দীক্ষা নিয়ে ফেলছেন তিনি। ধর্মের রক্ষাকবচ নিয়ে চুমকি-বসানো ঝলমলে পোশাক পরে প্রাক্তন বিদ্রোহী ডিলান নবরূপে হাজির হয়েছেন নৃত্যপ্রধান জলসার মঞ্চে। কুর্নিশ করতে করতে ঘোষণা করেছেন : "আমি এখন নেহাত বিনোদনশিল্পী।" সত্তরের গোড়ায় কবিতায় কোহেন লিখেছিলেন "মৃত আর আগামী ডিলানদের তালিকার" কথা। সেই তালিকায় মৃত ডিলানের নাম ডিলান নিজেই লিখে দিলেন বড় বড় করে সত্তরের শেষে ও আশির গোড়ায়। 'ফিরে আয় ববি" বলে ফেলে-যাওয়া সতীর্থদের ভিড়ে দাঁড়িয়ে অনেকদিন আগে যিনি আকুল হয়ে গান গেয়েছিলেন সেই জোন বায়েজ ইতিমধ্যে আত্মজীবনী লিখে ফেলেছেন আশির দশকে। যেন তাঁর গণমুখী-শিল্পজীবনে পড়েছে পূর্ণচ্ছেদ। আশির দশকে আমেরিকায় ও ইউরোপে যেসব প্রগতিবাদী আন্দোলন, পরমাণু অস্ত্রবিরোধী, বর্ণবাদবিরোধী, পরিবেশবাদী আন্দোলন চলেছে যেখানে "ববি" ও "ফিরে-আয়-ববি"র লেখিকা-গায়িকা দু'জনেই অনুপস্থিত। সেখানে বরং দেখা গিয়েছে ক্যালিপ্‌সো-গায়ক হিসেবে পরিচিত হ্যারি বেলাফন্টেকে।

লেনার্ড কোহেন এই মিছিলে কোনোদিনই ছিলেন না। কোনোদিনই কোনো আন্দোলনের শিখরে ওঠেননি তিনি গিটার হাতে। অথচ, সত্তরে যিনি কবিতায় সরবে প্রতিবাদ জানিয়েও গানের লিরিকে ছিলেন ঢের মৃদুভাষী, আশির দশকের প্রায় শেষের দিকে এসে তাঁর লিরিক চলেছে

আজ জোরেসোরে প্রতিষ্ঠান বিরোধিতার পথে। প্রতিবাদী ষাটের দশক ও সেই দশকের প্রাসঙ্গিক গানের শ্রেষ্ঠ নির্মাতা বব ডিলান যখন ইতিহাস হয়ে উঠেছেন কোহেন তখনই রচনা করতে শুরু করেছেন প্রতিবাদী গানের ইতিহাসে এক নতুন অধ্যায়। প্রাক্‌পুরাণিক বাল্যবন্ধুরা যখন হাল ছেড়ে দিয়েছেন, কালচার-ইনডাস্ট্রির মালিক-পরিচালক ও তাঁদের চাটুকার সাংবাদিক সমালোচকদের দল যখন আধুনিক গানকে করে তুলেছেন প্রতি-সপ্তাহের "টপ টেন" সেরা দশের হিসেব যা সংকট কবলিত শেয়ার বাজারে শেয়ারের দামের মতো ক্রমাগত ওঠানামা করে, লেনার্ড কোহেনের গান তখন নিয়েছে অঙ্গীকারবদ্ধ বিরোধীর ভূমিকা।

তিপ্পান্ন বছর বয়স হয়ে গেল লেনার্ড কোহেনের। এ-বয়সে আধুনিক গানের আসরে এসে দাঁড়াতে হলে বুকের পাটা থাকা চাই। কারণ কত কয়েক বছরে পাশ্চাত্যের আধুনিক গান আর 'হার্ড-হেভি-পাংক-মেটালের' পুচ্ছটিকে উচ্চে তুলে নাচাতে এত ব্যস্ত যে তাকে "আয়রে সবুজ" বলে সম্ভাষণ জানাতে ভয় করে। পাশ্চাত্যের লঘুসংগীত থেকে "সংগীত" ক্রমশ উধাও, "লঘু" বিশেষণটি হয়ে উঠতে চাইছে বিশেষ্য। তার শিল্পীরাও চিরকিশোর-চিরনাবালক-সুপারস্টার, যাঁদের গলাবাজী, নর্তনকুর্দন, একঘেয়ে ঢক্কানিনাদ ও অর্থহীন অপ্রাসঙ্গিক গান আজ আমাদের দেশের নামজাদা সংগীত-পরিচালকরা অনুকরণ করে চলেছেন।

এরই মাঝখানে তিপ্পান্ন বছর বয়সী লেনার্ড কোহেন কি বেমানান? হ্যাঁ, বেমানান তিনি হতেন বৈকি, যদি তিনি 'তেইশ' এমনকি 'তিরিশ' সাজার ভান করতেন। তা না করে তিনি তিপ্পান্নর গানই লিখছেন, গাইছেন,

"বন্ধুরা বিগত
চুলে ধরেছে পাক
খেলার জায়গাগুলো এখন
ব্যথায় হচ্ছে খাক্‌।
প্রেমের জন্য ক্ষ্যাপা
কোথায় 'পথের বঁধু'।
গানেরই মিনারে
ভাড়া গুণছি শুধু।...."

খুব সযত্নে বাঁচিয়ে রাখছেন কোহেন-সাংগীতিক যথেচ্ছাচারের এই যুগে তাঁর নিজস্ব আচার। বেশি কাজ করছেন না। আশির দশকে তাঁর মোটা দু'খানি অ্যালবাম বেরিয়েছে। সুপারস্টার হয়ে যাবার ভয় তাঁর

নেই। নির্ভয়ে অবিরাম শানিয়ে নিচ্ছেন তিনি তাঁর অস্ত্রগুলো, তার ভাষা, তাঁর গভীর উচ্চারণ, সমালোচনা, ভাবনা, কবিতার লাইন, গানের লিরিক, তাঁর কণ্ঠ। আজকের প্রসঙ্গগুলো থেকে তাঁর দৃষ্টি একটুও বিচ্যুত নয়। "গানের মিনারে ভাড়াটে' এই কোহেন শ্যেণদৃষ্টিতে তাকিয়ে আছেন সমকালের দিকে। যা তাঁর অপছন্দ, যার তিনি বিরোধী, তার বিরুদ্ধে তাঁর উচ্চারণ প্রত্যক্ষ।

"আপনার ঐ ফ্যাশনব্যবসা আমার পছন্দ নয়। যে বড়িগুলো গিলে আপনি তন্বী থাকেন,

সেগুলোও নয়। আমার বোনের যা গতি হয়েছে, সেটাও পছন্দ করি না প্রথমে নেব।

ম্যানহ্যাটান, তারপর বার্লিন।"

ডিলান—পেরোনো যুগের গোড়ায় নামী-শিল্পীরা লেনার্ড কোহেনের কাছে ছুটে গিয়েছিলেন তাঁর প্রতিষ্ঠানবিরোধিতার টানে ততটা নয়, বরং তাঁর অদ্ভুত প্রেমের গানের টানে। আজ, আশির দশকের এই শেষদিকে কোহেন গীতিকার ও গায়ক হিসেবে প্রতিষ্ঠানবিরোধিতায় সোচ্চার হয়েও প্রেমের গান লেখা ছাড়েননি। এ-বয়সে তাঁর প্রেমের ভাবনা আর সেই 'সুজ্যানের' যুগে পড়ে নেই। বসন্ত যে এবারের মতো বিগত, কোহেন তা জানেন। তাই বলে তাঁর গানে কিন্তু বিষাদের ছায়া পড়েনি। আগেকার রোমান্টিকতার সঙ্গে এতদিন যোগ দিয়েছে একধরনের রসিকতা তাঁর সমকালীন প্রেমের গানে :

"যদি প্রেমিক চাও, যা বলবে তাই করব। অন্যরকম প্রেম চাইলে মুখোশ পরে ফেলব।

সঙ্গী যদি চাও, আমারই হাত ধর। মারতে যদি চাও, আমায় আঘাত কর। আমিই তোমার পুরুষ।

বক্সার চাই। — রিঙে আমিই যাব। ডাক্তার চাই? — পরীক্ষা করাব। ড্রাইভার চাই? — এসো।

উঠে পড়। কান ধরে ঘোরাবে? — সে তো তুমিই পার।

আমিই তোমার পুরুষ।

যাঃ, চাঁদটা বড্ডো কড়া। দু'হাতের হাতকড়া। জন্তুটা তো জেগে। তোমায় দেওয়া প্রতিশ্রুতির।

পথ ধরেছি বেগে। ভিক্ষে চেয়ে কাউকে বুঝি ফেরত আনা যায়? — যদি-বা যায়, তোমার সামনে

হামাগুড়িই দেব। তোমার পায়ের কাছে আমি রাস্তায় লুটোব। ভাদ্দুরে কুকুরের মতো তোমার

ও-রূপ দেখে, ককিয়ে উঠব বিলাপ করব আমিই থেকে থেকে। তোমারই বেডকভার আমি

টান দেব দাঁত দিয়ে। ভিক্ষে চাইব, তোমায় চাইব কেঁদে ও ককিয়ে। আমিই তোমার পুরুষ।"

আশির দশকের মাঝামাঝি থেকে লেনার্ড কোহেনের গানে তাঁর যে তীব্রতা, তাঁর দু'দশক-দেড় দশক আগের গানে এটা ঠিক এ-মাত্রায় ছিল না। সে-সময়ে তাঁর কবিতায় ছিল নগ্ন প্রত্যাখ্যান, বিদ্রূপ, প্রতিবাদ। গানের লিরিক কিন্তু ছিল সে তুলনায় অনুচ্চ, নেপথ্যমুখী। আজ, লেনার্ড কোহেনের গান ও কবিতা তাদের সেই ভূমিকা বদল করেছে। সমকালে, প্রত্যাখ্যান সমালোচনা প্রতিষ্ঠানবিরোধিতা আর পরিহাস হয়ে উঠেছে কোহেনের গানের অবয়ব। লিরিকের এমনই এক তীক্ষ্ণ প্রত্যক্ষতা তিনি বিষয় ও ভাষার উপাদানে গঠন করে নিয়েছেন, এমনই এক দুরন্ত গতি নিয়ে এসেছেন তিনি তাঁর লিরিকে যে এই ছুটন্ত কাঠামোটাকে সামলানো মুশকিল। হয়তো ভারসাম্য রক্ষার তাগিদেই তাঁর আশির কবিতাকে দিতে চাইছেন তিনি একটা নিজস্ব নির্জনতার মাত্রা। যেখানে আর "আমরা" নেই, আছে শুধু আজকের "আমি", যেখানে "প্রথমে ম্যানহ্যাটান, তারপরে বার্লিন" দখল করার তাগাদা নেই, আছে বরং আত্মজিজ্ঞাসা এবং এই বৈরী দুনিয়ায় কোথাও একটু আশ্রয় পাবার তাগিদ :

"যখন আমার রাগ বা দুঃখ নেই
যখন তুমি আমায় ছেড়ে যাও
তখনই ভয় পাই
পেটটা যখন ভরা
মাথায় আপ্তবাক্য
তখনই ভয় পাই
তোমার ঘরে ছুটি তখন যেমন ছোটে শিশু
রাতবিরেতে বাবামায়ের ঘরে।"